ভারতের আদিবাসী

হিমাংশুমোহন রায়, এম.এস-সি. ; পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, নৃ-তত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবাসী মরণিং কলেজ, কলিকাতা

ভূমিকা সম্বলিত

প্রবোধকুমার ভৌমিক, এম.এস-সি. ; পি-এইচ.ডি. ; ডি.এস.সি.
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৮৭

প্রকাশক :
শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়
১৫/১এ, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মঙ্গলাচরণ

আমাদের দেশে প্রায় সওয়া চার কোটির মত আদিবাসীর বাস। এই আদিবাসী বলতে আমরা ভারতের তথাকথিত আদিম বাসিন্দাদের উত্তর-সূরীদের বুঝি। হাজার হাজার বছর আগে ভারতের নানাস্থানে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের ব্যবহৃত পাথরের তৈরী নানা অস্ত্রশস্ত্রে এ সবের পরিচয় মিলে। যদিও আদিবাসী অর্থে আমরা সমগ্রভাবে সমাজের এক দুর্বলতর প্রাচীন বাসিন্দাদের মনে করি ; কিন্তু তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। অবয়বের ধরনে, ভাষা ও সংস্কৃতির রূপ-রেণুতে তাদের এই ব্যবধান অতি সহজে অনুমান করা যায়। জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে, সামাজিক গঠনে অথবা অনুশাসনে রীতি-নীতি পূজা-পদ্ধতি কখনও বা অশরীরী শক্তিকে তুষ্ট করার নানা চেষ্টার এই বৈষম্য অনুরণিত। ইতিহাসের দিকচক্রবালে অথবা প্রাগ্‌ইতিহাসের আলোছায়ায়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আনাগোনায়, সম্পর্ক ও সংশ্লেষের বেগময়তায় অথবা মন্থরতায় তাদের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল নানাভাবে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবন পরিধি কখনও সংকুচিত হয়েছে আর কখনও বা হয়েছে প্রসারিত। ভিন্নমুখী এই পরিবর্তনের স্রোত।

প্রত্ন প্রস্তর যুগের শিকার-নির্ভর আরণ্যক জীবনের কোথাও কোথাও ছন্দপতন ঘটল—উদ্ভূত হল ভূমি-লগ্ন কৃষক জীবন যারা স্থায়ী বসবাসের সূচনায় নতুন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারপর, ইতিহাসের টানা-পোড়েনে এই অর্থনৈতিক জীবনের মোড় নানাভাবে পাল্টাতে শুরু করল ; কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই পরিবর্তন সর্বত্র সমান নয়। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে যে নতুন সংবিধান রচিত হয় তাতে ভারতের পিছিয়ে পড়া দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলিকে তফ্‌শিলভুক্ত (Scheduled) করা হয়েছে —যার মাধ্যমে এরা সংবিধানের সুযোগ সুবিধা পায়। এটা সকলের বিশ্বাস যে সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধায় ও নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই আদিবাসী গোষ্ঠী নতুনভাবে বাঁচার পথ পাবে এবং দীর্ঘদিনের অসম-সমাজও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে।

ডঃ হিমাংশুমোহন রায় একজন কৃতী ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্পর্কে যে কেবল গবেষণা করেছেন তা নয় নানাভাবে সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁর গবেষণার কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ্‌ ফিলজফি উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে কেবল যে তথ্য রয়েছে তা নয় এক সহৃদয় আন্তরিকতা ব্যক্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস ডঃ রায়ের এই পুস্তিকাটি জনসমাজে আদৃত হবে।

৫ই অক্টোবর
১৯৮০

প্রবোধকুমার ভৌমিক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক

আমার কথা

ভারতের উপজাতির কথা কাহারও অজানা নয়। তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, দিনচর্যা, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, বিবাদ-বিসম্বাদ, অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, সবকিছু পরিবেশ পরিমণ্ডলের সঙ্গে অভিযোজন করিয়া চিরসহিষ্ণু মানুষগুলি হাসিমুখে সকল অবস্থাকে যেন মানিয়া চলিয়াছে।

আমি ছাত্রজীবন হইতে উপজাতির বিষয়ে নানাকথা আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি। তাঁহারই নিকট হইতে আদিবাসীদের বিষয়ে কিছু লেখার অনুপ্রেরণা পাইয়াছি। তাই তাঁহার নিকট আমার ঋণের শেষ নাই।

এই পুস্তকখানিতে ভারতের আদিবাসীদের জীবনচরিত, বর্তমানের কল্যাণমূলক কাজের প্রতিফলন একই সংগে সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই পুস্তকখানি নৃ-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও নৃবিজ্ঞান অনুরাগী ও উপজাতি জীবন সন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট কিছু তথ্য দিতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই পুস্তকখানি লেখাতে আরও যাঁদের কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি তাঁহারা হইতেছেন ডঃ জ্যোৎস্নাকান্তি বসু, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা ডঃ উজ্জলকান্তি রায়, সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের উপ-অধিকর্তা ডঃ অমলকুমার দাশ, বঙ্গবাসী মরণিং কলেজের অধ্যাপক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বঙ্গবাসী কলেজের ডঃ রেবতীমোহন সরকার, বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজের ডঃ কার্তিকচন্দ্র শাসমল আরও অনেক সতীর্থের। তাই আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

মহালয়া, ১৩৮৭
বঙ্গবাসী মরণিং কলেজ
১৯ স্কট লেন, কলিকাতা-৯

হিমাংশুমোহন রায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

উপজাতি সম্প্রদায়

ভারতের আদিবাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় উপজাতি (Indian Tribe)

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতভূমির নানা অঞ্চলে নানা আকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী প্রাচীন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে অনেক দূরে নিজেদের বেষ্টন রচনা করিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। ইহারাই কোন সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রাক্-আর্য যুগে প্রথম সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। ইহাদেরকে অনার্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। কালক্রমে আর্যদের ভারতে আগমনের ফলে আর্য সংস্কৃতির সংঘাতে তাহারা বাধ্য হইয়া মানুষের সংস্পর্শের বাহিরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে গিরিগুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের জীবনে দ্রুত পরিবর্তন না হইয়া এখনও তাহারা বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেকটা অনগ্রসর সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন গোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতি নির্ভরশীল। যাহাদের উপজাতি (Tribe) বা আদিবাসী (Aboriginal বা Autochthonous) বলা হয়।

'আদিবাসী' শব্দটি সাম্প্রতিক কালে ব্যবহার করা হইলেও আদিবাসী বলিতে যে জনগোষ্ঠী বুঝায় তাহারা আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত নানাভাবে যুক্ত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, জয়দেবের রচনায় কিংবা চর্যাপদের কোন কোন পদে শবর প্রমুখ উপজাতীয় রাগরাগিণীতে পদগুলি গাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন মন্দিরগাত্রের শিল্পকলায় তাহাদের পর্ণভূষিত চিত্রাবলী আছে। 'কীর্তন' শব্দটি সম্ভবতঃ এক আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছ থেকেই লওয়া হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরান ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরান প্রভৃতি ঐতিহাসিক কালের গ্রন্থে বাংলার নানা উপজাতির উল্লেখ রহিয়াছে। বিবাহঅনুষ্ঠানে হলুদ, পান ইত্যাদি ব্যবহারের রীতির মধ্যে কেউ কেউ আদিবাসীদের প্রভাব খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

এই গোষ্ঠীর মানুষ কাহারা? অতি সহজ ভাষায় বলা যায়, "এক গোষ্ঠীর মানুষ যাহারা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করে, যাহাদের

সামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক আকৃতি বিদ্যমান, একই ভাষায় কথা বলে, একই ধরনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সমতা রক্ষা করিয়া নির্দিষ্ট ছন্দে ও বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাদিগকে উপজাতি বা আদিবাসী বলা হয়।"

আদিবাসী সম্বন্ধে বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন :—

(১) ডঃ রিভার্স (Rivers)-এর মতে "সমাজের একটি গোষ্ঠী যাহাদের জীবনে জটিলতা নাই, তাহারা এখনও একই ভাষা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, যাহাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়মকানুন রক্ষার জন্য তাহাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করিয়া থাকে।"

(২) গিলীন (Gillin) এবং গিলীন (Gillin)-এর মতে "এক গোষ্ঠীর নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যাহারা একটি সাধারণ অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সংস্কৃতি পালন করে।"

(৩) পিডিংটন (Piddington)-এর মতে "উপজাতি হইতেছে এক গোষ্ঠীর মানুষ, যাহারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য (Hom ogeneity) বিদ্যমান।"

(৪) ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (D. N. Majumdar)-এর মতে "উপজাতি হইল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা একগোষ্ঠীর পরিবার, যাহাদের নামের সমতা থাকে, সভ্যরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধানিষেধ মানিয়া চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা সামঞ্জস্য ও আদানপ্রদান থাকে।"

(৫) প্রবোধকুমার ভৌমিকের মতে "স্থান-কালের বন্দী বা আদিম জীবনাবদ্ধ গোষ্ঠী, যাদের ভাষায় ও ধর্মাচরণের মাধ্যমে এক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এবং সেই সবের মাধ্যমে তাহারা নিজদিগকে এক বিশেষ গোষ্ঠী বলে দাবী করে। এদের জীবনে অর্থনৈতিক মান অত্যন্ত নিম্ন, সামাজিক স্তরভেদ কম ও পেশায় বিশেষায়ণ (Specialization) হয়নি।"

উপরিলিখিত সংজ্ঞাগুলি হইতে উপজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়।

উপজাতির বৈশিষ্ট্য :

(১) **সাধারণ বাসস্থান**—উপজাতিদের সাধারণত নির্দিষ্ট অঞ্চল থাকিবে। অবশ্য সকল উপজাতিই যে একই জায়গায় বসবাস করিবে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কেননা যে সমস্ত উপজাতি যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের স্থান পরিবর্তনই বৈশিষ্ট্য, তথাপি যাযাবর জীবন নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) **একতাবদ্ধতা**—দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল পরস্পরের মধ্যে একতাবদ্ধতা অনুভব করা, যাহার ফল হইল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ রক্ষা করা।

(৩) **সাধারণ ভাষা**—একই ভাষায় কথা বলা যাহাতে গোষ্ঠী মনোভাব উদ্ভূত হয়।

(৪) **রক্ত সম্বন্ধতা**—উপজাতিদের প্রত্যেকেই মনে করে এবং দাবী করে যে পরস্পরের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে। তাহারা একই বংশ হইতে উদ্ভূত।

(৫) **অন্তর্বিবাহ**—প্রত্যেক উপজাতিই সাধারতনিজস্ব উপজাতির মধ্যে বিবাহ করে। এক উপজাতি অন্য কোন উপজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চায়না।

(৬) **সাধারণ সংস্কৃতি**—অন্তর্বিবাহ ছাড়াও ইহাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি বিদ্যমান যাহার দ্বারা উপজাতি সমাজের সামাজিক কাঠামো ও কার্যক্রম রক্ষা পায়।

(৭) **সাধারণ ধর্ম**—ইহারা জড় উপাসক অর্থাৎ প্রকৃতি পূজারী, যেমন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু প্রভৃতির পূজা করে।

(৮) **সাধারণ নাম**—উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে একই ধরনের নাম ব্যবহার করে যাহাতে পরস্পরের নাম ভুলিয়া যাইতে কষ্ট না হয়। সাধারণ নামের মাধ্যমে পরস্পরকে মনে করার ও চিনিবার সুবিধা হয়।

ভারতীয় উপজাতির শ্রেণী বিভাগ :—

ভারতীয় উপজাতি যাহারা তপশীলী অন্তর্ভুক্ত তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয় আঞ্চলিক, দৈহিক, ভাষা, পেশা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী।

১। আঞ্চলিক বিভাগ :

ভারতীয় উপজাতির বিস্তৃতি ও ইহাদের বসতির ঘনত্ব অনুযায়ী ইহাদের ছয়টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

(ক) **উত্তর-পূর্বাঞ্চল**—এই অঞ্চলের মধ্যে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বাস করে আকা, ডাফ্লা, মিরি, সেমা-নাগা, আও-নাগা, লোঠা-নাগা, খাসী, গারো ইত্যাদি।

(খ) **উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল**—এই অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র হিমাচল প্রদেশ, তাছাড়া পাঞ্জাব হইতে যে সকল স্থান বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং উত্তরের উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের জেলাসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে বাস করে লেপ্চা, ভোটিয়া, রাভা ইত্যাদি এবং উত্তরপ্রদেশের উপজাতি যেমন ভোট, করওয়া, চেরী ইত্যাদি।

(গ) **মধ্য ও পূর্বাঞ্চল**—এই অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে বাস করে শবর, গাদাবা, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, লোধা, হো, বীরহড়, কোল, খাড়িয়া, জুয়াং, খন্দ ইত্যাদি।

(ঘ) **দক্ষিণাঞ্চল**—কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এই অঞ্চলে বাস করে চেঞ্চু, কোটা, কুরুম্বা, বাদাগা, টোডা, কাদার, মুথুভান, উরালী, কানিক্কার ইত্যাদি।

(ঙ) **পশ্চিমাঞ্চল**—ইহার মধ্যে রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। এখানে বাস করে গণ্ড, ভীল ইত্যাদি।

(চ) **দ্বীপাঞ্চল**—সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানে বাস করে আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গে ইত্যাদি।

১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী

ভারতের ছয়টি অঞ্চলের রাজ্য অনুযায়ী উপজাতি সংখ্যা

অঞ্চল	তপশীলী আদিবাসী সংখ্যা	মোট আদিবাসীর শতকরা
(ক) উত্তর-পুর্বাঞ্চল		
১। আসাম	১৬,০৬,৬৪৮	৪·১২
২। মেঘালয়	৮,১৪,২৩০	২·১৪
৩। অরুণাচল প্রদেশ	৩,৬৯,৪০৮	০·৯৫
৪। নাগাল্যাণ্ড	৪,৫৭,৬০২	১·২০
৫। মণিপুর	৩,৩৪,৪৬৬	০·৮৭
৬। মিজোরাম	৩,১৩,২৯৯	০·৮২
৭। ত্রিপুরা	৪,৫০,৫৪৪	১·১৭
	৪৩,৪৬,১৯৭	১১·২৭
(খ) হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম ভারত		
৮। উত্তরপ্রদেশ	১,৯৮,৫৬৫	০·৫২
৯। হিমাচল প্রদেশ	১,৪১,৬১০	০·৩৭
	৩,৪০,১৭৫	০·৮৯
(গ) মধ্য ও পুর্বাঞ্চল		
১০। বিহার	৪৯,৩২,৭৬৭	১২·৯৮
১১। উড়িষ্যা	৫০,৭১,৯৩৭	১৩·৩৪
১২। পশ্চিমবঙ্গ	২৫,৩২,৯৬৯	৬·৬৬
১৩। মধ্যপ্রদেশ	৮৩,৮৭,৪০৩	২২·০৬
	২০৯,২৫,০৭৬	৫৫·০৪

অঞ্চল	তপশীলী আদিবাসী সংখ্যা	মোট আদিবাসীর শতকরা
(ঘ) দক্ষিণাঞ্চল		
১৪। অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬,৫৭,৬৫৭	৪·২৬
১৫। কর্ণাটক	২,৩১,২৬৮	০·৫১
১৬। তামিলনাড়ু	৩,১১,৫১৫	০·৭২
১৭। কেরালা	২,৬৯,৩৫৬	০·৭১
	২৪,৬৯,৭৯৬	৬·২০
(ঙ) পশ্চিমাঞ্চল		
১৮। রাজস্থান	৩১,২৫,৫০৬	৮·২২
১৯। মহারাষ্ট্র	২৯,৫৪,২৪৯	৭·৬৭
২০। গুজরাট	৩৭,৩৪,৪২২	৯·৬২
২১। গোয়া, দমন, দিউ	৭,৬৫৪	০·০৯
২২। দাদরা নগর হাভেলী	৬৪,৪৫৫	০·১৭
	৯৮,৮৬,১৭৬	২২·৪৭
(চ) দ্বীপাঞ্চল		
২৩। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১৮,১০২	০·০৫
২৪। লাক্ষাদ্বীপ	২৯,৫৪০	০·০৮
	৪৭,৬৪২	০·১৩

জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী এবং পণ্ডীচেরীতে কোন তপশীলী উপজাতি নাই।

১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা

	ভারত	%	পশ্চিমবঙ্গ	%
মোট লোকসংখ্যা	৫৪,৭৯,৪৯,৮০৯	১০০	৪৪,৩১২,০১১	১০০
তপশীলী জাতি	৮,০০,০৫,৩৯৮	১৪·৬০	৮,৮১৬,০২৮	১৯·৯
তপশীলী উপজাতি	৩৮,০১৫,১৬২	৬·৬৬	২৫,৩২ ৯৬৯	৫·৭

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ও তপশীলী আদিবাসী সংখ্যা

জেলা	মোট জনসংখ্যা		তপশীলী আদিবাসী সংখ্যা		তপশীলী আদিবাসী
	মোট	সারা রাজ্যের শতকরা	মোট	সারা রাজ্যের আদিবাসীর শতকরা	
১। কলিকাতা	৩১,৪৮,৭৪৬	৭.১১	২,৪০৮	০.০৯	ওঁরাও, সাঁওতাল, গারো, মুণ্ডা, ভুটিয়া, লেপ্‌চা, হাজং ইত্যাদি।
২। কোচবিহার	১৪,১৪,১৮৩	৩.১৯	১০,৬১১	০.৪২	ওঁরাও, সাঁওতাল, গারো, মুণ্ডা, রাভা, মেচ্‌ ইত্যাদি।
৩। চব্বিশ-পরগনা	৮৪,৪৯,৪৮২	১৯.০৬	১,৩৭,১৯৭	৫.৪২	ওঁরাও, ভূমিজ, মালপাহাড়িয়া, মুণ্ডা, হো ইত্যাদি।
৪। জলপাইগুড়ি	১৭,৫০,১৫৯	৩.৯৫	৪,২৮,৫৯৫	১৬.৯২	ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া, গারো, নাগেসিয়া, ভুটিয়া, মেচ্‌, রাভা ইত্যাদি।
৫। দার্জিলিং	৭,৮১,৭৭৭	১.৭৬	১০৮,৫৮৬	৪.২৯	ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাল-পাহাড়ীয়া, খাড়িয়া, নাগেসিয়া, মেচ্‌, লেপচা, ভুটিয়া ইত্যাদি।
৬। নদীয়া	২২,৩০,২৭০	৫.০৩	৩১,৭৯৯	১.২৬	ওঁরাও, কোড়া, গারো, ভূমিজ, মাল-পাহাড়ীয়া, মুণ্ডা, মু., সাঁওতাল ইত্যাদি।
৭। পশ্চিম দিনাজপুর	১৮,৫৯,৮৮৭	৪.২০	২,২১,৩১৭	৮.৭৪	সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাহালী, কোড়া ইত্যাদি।

জেলা	মোট জনসংখ্যা		তপশীলী আদিবাসী সংখ্যা		তপশীলী আদিবাসী
	মোট	সারা রাজ্যের শতকরা	মোট	সারা রাজ্যের আদিবাসীর শতকরা	
৮। পুরুলিয়া	১৬,০২,৮৭৫	৩·৬১	৩,১৩,৭৯৩	১২·৩৯	সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, ওঁরাও, খাড়িয়া, বীরহড়।
৯। বর্ধমান	৩৯,১৬,১৭৪	৮·৮৩	২,২৮,৬০৫	৯·০২	সাঁওতাল, কোড়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাহালী।
১০। বাঁকুড়া	২০,৩১,০৩৯	৪·৬২	২,০৮,৭৬৫	৮·২৪	সাঁওতাল, কোড়া, ভূমিজ, খাড়িয়া, ওঁরাও ইত্যাদি।
১১। বীরভূম	১৭,৭৫,৯০৯	৪·০১	১,২১,২১০	৪·৯৬	সাঁওতাল, কোড়া, মাহালী, ওঁরাও।
১২। মালদহ	১৬,১২,৬৫৭	৩·৬৪	১,৬০,৭১৫	৫·১৬	সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালী, কোড়া, মুণ্ডা ইত্যাদি।
১৩। মুর্শিদাবাদ	২৯,৪০,২০৪	৬·৬৩	৩৮,৯৪৭	১·৫৪	সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাল-পাহাড়ীয়া, মাহালী।
১৪। মেদিনীপুর	৫৫,০৯,২৪৭	১২·৪৩	৪,৪২,৯৬১	১৭·৪৯	সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, লোধা, খাড়িয়া ইত্যাদি।
১৫। হাওড়া	২৪,১৭,২৮৬	৫·৪৫	৩,৩৬৪	০·১৩	ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো ইত্যাদি।
১৬। হুগলী	২৮,১২,১১৬	৬·৪৮	১,০০,০৮৪	৩·৯৫	সাঁওতাল, ভূমিজ, কোড়া, ওঁরাও।
মোট :—	৪,৪৩,১২,০১১	১০০·০০	২৫,৩২,৯৬৯	১০০ ০০	

পশ্চিমবঙ্গে তপশীলী আদিবাসী সম্প্রদায়

১। অসুর	২০। বৈগা
২। ওঁরাও	২১। ভুটিয়া, (কগাতে, টোটো তিব্বতী, দুকপা, শেরপায়ালমো)
৩। করমালি	২২। ভূমিজ
৪। কিসান	২৩। মগ
৫। করওয়া	২৪। মালপাহাড়িয়া
৬। কোড়া	২৫। মাহলি
৭। খারওয়ার	২৬। মাহালি
৮। খন্দ	২৭। মুণ্ডা
৯। গয়াইত	২৮। মেচ্‌
১০। গারো	২৯। ম্রু
১১। গণ্ড	৩০। রাভা
১২। চাক্‌মা	৩১। লেপ্‌চা
১৩। চিক বারিক	৩২। লোধা, খেড়িয়া বা খাড়িয়া
১৪। চেরো	৩৩। লোহরা, লোহারা
১৫। নাগেশিয়া	৩৪। শবর
১৬। পারহাইয়া	৩৫। শাওড়িয়া, পাহাড়িয়া
১৭। বিরজিয়া	৩৬। সাঁওতাল
১৮। বিরহড়	৩৭। হাজং
১৯। বেদিয়া	৩৮। হো

২। দৈহিক আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ :

ভারতীয় উপজাতিদের দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় :—

(ক) **মঙ্গোলীয় শ্রেণী** (Mongoloid)—মঙ্গোলীয় শ্রেণী গোষ্ঠীর উপজাতি সমূহ হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে বসবাস করে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইল চ্যাপ্টা মুখমণ্ডল, গণ্ডদেশ সমুচ্চ, ইহাদের দেহে চুলের স্বল্পতা

দেখা যায়, মাথার চুল সোজা, গায়ের রং হলুদ, চোখে মঙ্গোলীয় ভাঁজ (epicanthic fold) বর্তমান, উচ্চতায় মাঝারি আকৃতির।

মঙ্গোলীয়রা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর (১) প্যালিও মঙ্গোলীয় (Palaeo Mongoloid), (২) তিব্বতী মঙ্গোলীয় (Tibeto Mongoloid)। প্যালিও মঙ্গোলীয়রা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্যালিও মঙ্গোলীয় চওড়া মাথা ও প্যালীও মঙ্গোলীয় লম্বা মাথা।

প্যালিও-মঙ্গোলীয় চওড়া মাথা (Palaeo-Mongoloid Broad-headed)—চওড়া মাথা, গাঢ় বাদামী গায়ের রঙ, মাঝারি নাক, মঙ্গোলীয় ভাঁজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, মুখমণ্ডল ছোট ও চ্যাপ্টা, মাথার চুল সোজা। কালিংপঙের লেপ্‌চা, টোটো, রাভা, চট্টগ্রামের চাক্‌মা ও মগ্‌ ইহার উদাহরণ।

প্যালিও-মঙ্গোলীয় লম্বা মাথা (Palaeo Mongoloid Long-headed)—লম্বা মাথা, মাঝারি নাক, মুখমণ্ডল ছোট ও চ্যাপ্টা, মঙ্গোলীয় ভাঁজ সবসময় দেখা যায় না। হিমালয়ের পাদদেশ সমূহে যেমন আসাম ও ব্রহ্মদেশে ইহাদের দেখা যায়। আসামের নাগা, খাসী ও নেপালের লিম্বুরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **তিব্বতী মঙ্গোলীয়** (Tibeto Mongoloid)—চওড়া মাথা, লম্বা ও চ্যাপ্টা মুখ, মাঝারি আকৃতির নাক। দেহে ও মুখে লোম ও দাড়ি গোঁফের অভাব, চোখে মঙ্গোলীয় ভাঁজ সুস্পষ্ট। তিব্বত, ভুটান ও সিকিমের অধিবাসীরা এই জাতির অন্তর্গত।

(২) **প্রোটো-অস্ট্রেলীয় জাতি** (Proto-Australoid)—ইহাদের দৈহিক আকৃতি বেঁটে হইতে মাঝারি উচ্চতা, লম্বা মাথা, চওড়া চ্যাপ্টা নাক, নাকের গোড়া বসা, কপাল উন্নত পর্যায়ের নয়, ভ্রূ বেশ সুস্পষ্ট, গায়ের রঙ বাদামী হইতে কালো, চুল ঢেউ খেলান।

ভারতের সমগ্র মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া ইহারা বাস করে। ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, বীরহড, শবর, লোধা, দক্ষিণ ভারতের চেন্‌চু, কুরুম্ব', বাদাগা, মধ্যভারতের কোল, ভীল ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **নিগ্রোবটু**—নিগ্রোবটু বা নিগ্রোটোরা ভারতের প্রথম ও প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহারা খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকার নিগ্রোদের

বংশধর। ইহারা খুব বেঁটে আকৃতির। ইহাদের গায়ের রঙ কালো, মাথায় ঘন কালো কুঞ্চিত (wooly) চুল, ঠোঁট মোটা ও উল্টানো। ইহাদের লম্বা, গোল ও চওড়া মাথা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের কাদার, ইরুলা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গে প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। ভাষাভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ

ভারতের ভাষাভিত্তিক মানচিত্র হইতে সহজেই বোঝা যায় দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় অঞ্চল এবং মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর, বেলুচিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লইয়া গঠিত।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার মানুষ হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নিকোবর দ্বীপ, মধ্যভারত এবং ইহার সহিত পশ্চিম ভারত অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতী-চীন ভাষার মানুষ হিমালয় অঞ্চলে বাস করে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মানুষ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা সম্বন্ধে নানা মত দেখা যায়। W. Schmidt, মুণ্ডা ভাষাকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা বলিয়াছেন। ১৯২৮ সালে Heine Golden তথ্য দিয়াছিলেন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ ভারতে আসিয়াছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে এবং তাহারা মুণ্ডা ভাষার অধিকারী ছিল। পরে মধ্য ভারতে মুণ্ডা ভাষা ছড়াইয়া পড়ে। হুটনের মতে হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোলরা আসিয়াছিল এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলিত। মং-খের ভাষার লোকেরা আসিয়াছিল হিমালয় অঞ্চল হইতে।

এই সকল ভাষা তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় উপজাতিদিগকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায় যাহারা নানা অঞ্চলে বিস্তৃত আছে।

(I) **অস্ট্রো-এশিয়া শ্রেণী**—(ক) মং খের শাখা—খাসী, নিকোবরী। (খ) মুণ্ডা শাখা—সাঁওতালী, হো, মুণ্ডারী, গণ্ডী, খাড়িয়া, শবর, খন্দ, গাদাবা ইত্যাদি।

(II) **তিব্বতী-চীনা অথবা সাইনো-তিব্বতী ভাষা গোষ্ঠী**—এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়—(ক) তিব্বতী-বার্মা। (খ) সাইয়ামীজ-চীনা।

আমেরিকার ভাষাতত্ত্ববিদ্ রবার্ট শেফার সাইনো-তিব্বতী ভাষাকে সাতটি ভাগে ভাগ করেন। (i) সাইনিটিক (ii) মাঝিক (iii) বডিক (iv) বারিক (v) ডাইক (vi) কারেনিক (vii) বার্মিক।

(ক) **তিব্বতী-বার্মা**

(i) **তিব্বতী-হিমালয় শ্রেণী**—দার্জিলিং-এর ভোটিয়া

(ii) **পশ্চিমের হিমালয়ের পার্বত্যভূমির শাখা**—চাম্বা, লাহলী, কানাড়ী, স্থাংলী ইত্যাদি

(iii) **হিমালয়ের পাদদেশের শাখা**—লেপ্‌চা, টোটো ইত্যাদি।

(iv) **অরুণাচল শাখা**—আকা, আবর, মিরি, ডাফ্‌লা, মিস্‌মী।

(v) **আসাম-বার্মা শাখা**

(ক) বড়ো শ্রেণী—সমতলভূমির কাছাড়ী, দায়মাস, গারো, ত্রিপুরী ইত্যাদি

(খ) **নাগা শ্রেণী**

(i) **নাগা শাখা শ্রেণী**—আঙ্গামী, আও, সেমা নাগা ইত্যাদি

(ii) **নাগা—বড়ো শাখা শ্রেণী**—কাছা নাগা, কাবুই নাগা

(গ) কোচীন শ্রেণী—শিংকো

(ঘ) কুকী-চীন শ্রেণী—মণিপুর, লুশাই, থাডো ইত্যাদি

(III) **দ্রাবিড় গোষ্ঠী**—করওয়া, ইরুলা, টোডা, কোটা, কুরুক্, ওঁরাও, কুই, খন্দ, গোণ্ডী ইত্যাদি

(IV) **ইন্দো-ইউরোপীয়**—হাজং, ভীল, ইত্যাদি

৪। অধ্যাপক **তারকচন্দ্র দাস** ১৯৫৭ সালে উপজাতির যে শ্রেণী বিভাগ করেন :—

(ক) ভীরু, লাজুক, ভবঘুরে খাদ্য অন্বেষণকারী এবং পশুপালক—যাহারা পাহাড়ের জঙ্গলে বাস করে এবং সমতলভূমির অধিবাসীর সংস্কৃতি হইতে দূরে থাকিতে চায়। বাঁচিবার জন্য প্রয়োজনে অত্যন্ত কষ্ট করে। অতি প্রাচীন ধরনের শিল্প কাজ করে। জীবনে প্রয়োজন অত্যন্ত কম। যদিও নাচ গান জানে তথাপি কোন উৎসব ছাড়া নিজেরা করে না। যেমন—রাঁচীর বীরহড়, কেওনঝোড়ের জুয়াং, পাল-লাহারা, ধলভূমের বন্য খেড়িয়া এবং উড়িষ্যার পাহাড়ী ভুঁইয়া।

(খ) স্বাস্থ্যবান্, বলবান্, আশাবাদী পাহাড়ী গাত্রের স্থানান্তর প্রথায় কৃষিজীবী—যাহাদের নিজস্ব পরিশ্রমে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য আছে এবং দলীয় সম্পদ, গ্রাম্য সম্পত্তির আকারে রক্ষিত থাকে। যেমন, সকল নাগা উপজাতি (আও, আঙ্গামী, রেঙ্গা), কুকী, গারো ইত্যাদি।

(গ) উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশের লাঙ্গল চাষী—যাহাদের সহিত অ-উপজাতি সম্প্রদায় বাস করে, যেমন ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, ইম্ফলে কাবুই নাগা, মধ্যপ্রদেশের গণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল।

(ঘ) হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতি যাহারা শহর ও কলকারখানায় যুক্ত। যেমন—মানভূমের, বাঁকুড়ার ভূমিজ, উড়িষ্যার ভুঁইয়া, পশ্চিমবঙ্গের কোড়া লোধা ইত্যাদি।

(ঙ) সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত (Assimilated) উপজাতি গোষ্ঠী যেমন—মণিপুরের মৈথী, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আসামের আহম, মধ্যপ্রদেশের রাজ-গণ্ড যাহারা হিন্দুসমাজের উচ্চ আসনের অধিকারী এবং আয় নির্ভর করে জমি এবং চাকুরী হইতে।

৫। সম্প্রতি **অধ্যাপক বিদ্যার্থী** ১৯৭৭ সালে উপজাতির শ্রেণী বিভাগ করেন। তিনি উপজাতির অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেন :—

(i) **জঙ্গলে শিকার**—এই সকল উপজাতির প্রধান অর্থনৈতিক জীবন হইল শিকার এবং খাদ্যসংগ্রহ। তাহারা গভীর জঙ্গলে বাস করে। যেমন জারওয়া, বীরহড়, করওয়া ইত্যাদি।

(ii) **পাহাড়ী চাষ**—ইহাদের প্রধান অর্থনৈতিক জীবন হইল স্থানান্তর প্রথায় চাষ। যদিও তাহারা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে তথাপি একই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকে। যেমন—খন্দ, গণ্ড, খাড়িয়া এবং কিছু উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি।

(iii) **সমতলভূমির কৃষি**—এই উপজাতি গোষ্ঠী বড় বড় গ্রামে বাস করে এবং সম্পূর্ণরূপে চাষের উপর নির্ভরশীল। যেমন—সাঁওতাল, ওঁরাও, গণ্ড, ভীল ইত্যাদি।

(iv) **সরল শ্রমশিল্পী ও গ্রাম্য (Folk) শিল্পী**—যে সমস্ত উপজাতি হস্তশিল্প এবং গ্রামীণশিল্পে যুক্ত। যেমন—লোহার, গুডুলিয়া লোহার, মাহালী ইত্যাদি।

(৮) **শিল্প ও শহরের মজুর**—উপজাতির একশ্রেণী শিল্প এবং শহরের পেশা অবলম্বন করিয়াছে। কিছু সংখ্যক উপজাতি নিজেদের বসতি ছাড়িয়া স্থায়ী অথবা ঋতুভিত্তিক পেশা গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় উপজাতির অর্থ নৈতিক জীবন

উপজাতি সমাজের অর্থনৈতিক জীবন দৈনন্দিন কার্যধারাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। ইহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিনিময়, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই কম এবং অনুন্নত পর্যায়ের। পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও সাংস্কৃতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে। ইহার জন্য নির্ভর করিতে হয় বনজ সম্পদ আহরণের উপর, শিকারের দ্বারা ও অনুন্নত প্রথায় চাষাবাদের দ্বারা, যাহাতে দৈনন্দিন চাহিদা মিটানো তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল।

উপজাতির অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

(১) সাধারণত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মুদ্রার চলন নাই। বিনিময়ই যথেষ্ট।

(২) আহরণ ও উৎপাদনের মাধ্যমে কোন লাভের পরিমাণ নাই।

(৩) নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই আহরণ ও উৎপাদন।

(৪) অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার বিদ্যমান।

(৫) অনুন্নত যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। উৎপাদনের জন্য সরল ও সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার, যাহার ফল উৎপাদন হ্রাস, সময় নষ্ট ও বিষয় সম্পত্তির অপব্যবহার।

(৬) অর্থনৈতিক কাজ নির্ভর করে যৌথ প্রচেষ্টার উপর, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা খুবই কম।

(৭) জীবনে বৈচিত্র্যতা নাই। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনেও সে রকম কোন ছাপ নাই।

(৮) প্রত্যেক উপজাতির অবশ্যই কিছু নিজস্ব সম্পত্তি থাকে।

(৯) ইহাদের সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক মাধ্যম নাই। মামুলি বৃহত্তরভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে বিনিময় (Barter) প্রচলিত।

(১০) বাহিরের পণ্য আমদানী নাই। অন্যান্য স্থানের উপর কেবলমাত্র লবণ এবং কাপড়চোপড় এর জন্য নির্ভর করিতে হয়।

(১১) তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিব্যাপ্তি নাই। সুতরাং আধুনিক প্রণালী, বর্তমান কৃষি যন্ত্রপাতি এবং নূতন উদ্ভাবনী চিন্তাধারার অভাব।

(১২) তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও প্রাচীন এবং নিম্ন স্তরের। অর্থনৈতিক গঠন এমন স্তরের যাহাকে অর্থনৈতিক গঠন বলা যায় না। কারণ খাদ্যের জন্য সবসময় উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়।

৬। ভারতীয় উপজাতির অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ

ভারতীয় উপজাতি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন নানা ধরনের। ইহার যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এই শ্রেণী বিভাগ মূলতঃ উপজাতি গোষ্ঠীর অর্থনীতিকে ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালে মদন এবং মজুমদার ভারতীয় উপজাতির অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে :—

(১) খাদ্যান্বেষণ (Food gathering)
(২) পশুপালন (Pastoralism)
(৩) স্থানান্তর প্রথায় চাষ (Shifting hill cultivation)
(৪) স্থায়ী চাষ (Settled agriculture)
(৫) হস্তশিল্প (Handicraft)
(৬) মজুর (Labour)
(ক) কৃষিমজুর (Agricultural labourer)
(খ) শিল্প মজুর (Industrial labour)

(১) **খাদ্যান্বেষণ** (Food gathering)—ইহা মানুষের আদিম বৃত্তি। খাদ্য সংগ্রহ বলিতে বনজঙ্গল হইতে গাছের ফলমূল ও পাতা সংগ্রহ ও পশু-

পক্ষী বা মৎস শিকার বুঝায়। এই বৃত্তি বা জীবিকা অনিশ্চিত কারণ যেদিন ফলমূল বা শিকার জুটিল সেদিন সকলে মিলিয়া আনন্দে ভক্ষণ করিল আর যেদিন জুটিল না সেদিন উপবাসে দিন কাটাইতে হয়। তথাপি আজও এইভাবে কোন কোন উপজাতি জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা সকলেই শিকারী। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল আন্দামানী দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গে, ছোটনাগপুরের বিরহড়, খাড়িয়া, হাইদ্রাবাদের চেনচু (Chenchu), জনাড়ি, কেরল প্রদেশের কাদার, কুরুম্বা, তামিল-নাড়ুর পালিয়া ইত্যাদি।

(২) **পশুপালন** (Pastoralism)—ইহা আর এক ধরনে জীবিকা যাহার মাধ্যমে কোন কোন উপজাতি প্রাণধারণ করিয়া থাকে এবং সম্প্রদায়-গুলি গৃহপালিত পশুর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পাহাড়ের টোডা (Toda) উপজাতিরা মহিষ প্রতিপালন করিয়া থাকে। মহিষকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। মহিষের দুগ্ধে তাহারা নানারকম খাদ্যসামগ্রী তৈয়ারী করে এবং প্রতিবেশী গোষ্ঠী বাদাগা (Badaga) ও কোটা (Kota)-দের নিকট হইতে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। টোডাদের দৈনন্দিন জীবন মহিষ ও মহিষের দুগ্ধকে লইয়া কাটিয়া যায়। আলমোড়া জেলার ভোট বা ভোটিয়াদের মিশ্রিত অর্থনৈতিক জীবন বলা যায়। তাহারা বৎসরের অর্ধেক সময় পশুপালন করে ও অর্ধেক সময় চাষ করে।

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন বরফ জমিতে থাকে তখন তাহারা তাহাদের মেষ লইয়া পাহাড়ের পাদদেশে চারণভূমিতে নামিয়া আসে আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন বরফ গলিতে শুরু করে তখন আবার উচ্চভূমিতে চলিয়া যায় এবং চাষ করিয়া থাকে। এইভাবে পশুপালন এবং চাষ দুইএর উপর জীবিকা নির্বাহ করে।

(৩) **স্থানান্তর প্রথায় চাষ** (Shifting Hill Cultivation)—স্থানান্তর প্রথায় চাষ বা বন্য প্রথায় চাষ অতি আদিমতম কৃষি পদ্ধতি। এই চাষ দ্বারা বহু উপজাতি জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। পাহাড়ের পাদ-দেশে একটানা প্রশস্ত মাঠ পাওয়া যায় না। সেইজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদী জমি বাহির করা হয়। শীতের শেষে কুড়াল (axe), কোদাল (hoe) বা খন্তা (spade) দ্বারা গাছপালা সরাইয়া ফেলা হয় এবং

গাছপালা শুষ্ক হইয়া গেলে গ্রীষ্মকালে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এইসব পুড়িয়া ছাই হয় এবং সারের কাজ করে। তারপর বর্ষার প্রাক্কালে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্ষায় গাছ বর্ধিত হইতে থাকে এবং শস্য পাকিয়া গেলে কাটিয়া ঘরে আনা হয়। এইভাবে একই জমি ৩।৪ বৎসর চাষ করার পর আবার অন্যত্র একই পদ্ধতিতে চাষ করিয়া থাকে। ইহাকে **স্থানান্তর প্রথায়** বা বন্য প্রথায় চাষ (Shifting Cultivation) বলে। আসামের নাগা বা কুকিরা এই চাষকে 'ঝুম' (jhum) চাষ বলে, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার রাজ্যের মারিয়া গন্দঃা ইহাকে 'পেণ্ডা', উড়িষ্যার খন্দ উপজাতিরা ইহাকে 'পদু', ভুঁইয়ারা বলে 'ডাহি', 'কামান' এবং বইগারা বলে 'বেয়ার'। এই চাষের উপর ভারতের নানা অঞ্চলের নানা উপজাতি নির্ভর করিয়া থাকে, যেমন উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের নাগা, খাসী, কুকী, গারো, ত্রিপুরী, চাক্‌মা, মগ্‌; সাঁওতাল পরগনার মালের, পাহাড়িয়া; বিহারের করওয়া, পাহাড়িয়া; উড়িষ্যার কুঠীয়াখন্দ; অন্ধ্রপ্রদেশের কামার, বইগা, মারিয়া গন্দ, মহীশূরের মালেকুড়িয়া প্রভৃতি। প্রায় ৩,৫৫,৫০৭ পরিবার উপজাতি স্থানান্তর প্রথায় কৃষিতে নির্ভরশীল এবং ১০'৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি স্থানান্তর প্রথায় চাষ হইতেছে।

স্থায়ী চাষ (Settled Agriculture): ভারতের সমতল ভূমির প্রায় সকল উপজাতি স্থায়ী চাষের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা তাহাদের প্রধান পেশা, তাছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলের কোন কোন উপজাতি স্থায়ী ভাবে চাষ করিয়া থাকে। আবাদী জমির আশেপাশে তাহাদের গ্রাম বা আস্তানা গড়িয়া উঠে। পরিবেশ পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করিয়া এই চাষ হইয়া থাকে; চাষের পদ্ধতি সকল জায়গায় সমান নয়। সাধারণতঃ স্থায়ী চাষকে দুইটি প্রথায় ভাগ করা যায়। (১) সমতলভূমিতে লাঙল চাষ (plough cultivation) (২) পার্বত্য ভূমিতে ধাপে ধাপে চাষ (terrace cultivation)।

(১) **লাঙল চাষ** (Plough cultivation)—এই চাষ করিতে লাঙল দরকার হয়। ইহার পদ্ধতি তিন প্রকার (ক) ছড়ান পদ্ধতি (খ) বপন পদ্ধতি (গ) রোপণ পদ্ধতি।

(ক) **ছড়ান পদ্ধতি** (Broadcasting method)—ধান, ভুট্টা, গম, চাষের জন্য অনেক সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। যে জমিতে বেশী

জল জমিয়া থাকে, নিয়মিত জমির যত্ন লওয়া যায় না সেখানে এই পদ্ধতি প্রধান অবলম্বন। এই পদ্ধতিতে বীজকে বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

(খ) **বপন পদ্ধতি** (Drilling method)—এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকে। এখানে বীজকে মাটির মধ্যে মধ্যে লাগাইয়া দেওয়া হয়।

(গ) **রোপণ পদ্ধতি** (Transplantation)—রোপণ পদ্ধতিতে ধান চাষ করিলে ফসল বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ছোট একখণ্ড জমিতে চারা গাছ তৈয়ারী করিয়া অন্যত্র বড় জমিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বর্ষাকালে এই চাষ হইয়া থাকে।

ধাপে ধাপে চাষ (Terrace cultivation)—পাহাড়ী অঞ্চলে সমতলভূমি পাওয়া না যাওয়ায় পাহাড়ের গাত্রকে কাটিয়া চারিপাশে বাঁধ দিয়া চাষের জমি বাহির করা হয়। এই জমিতে জল আটক করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হয়। ইহাকে ধাপ চাষ বলে।

উল্লিখিত স্থায়ী চাষের দ্বারা অনেক উপজাতি তাহাদের জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। হিমালয় অঞ্চলে লেপ্‌চা ও ভোটরা ধাপ চাষে নির্ভরশীল, মধ্য ভারতের ভূমিজ, কোড়া, ভুঁইয়া, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, হো, বাইগা ; পশ্চিম ভারতের ভীল, অন্ধ্রপ্রদেশের কয়া, বাঞ্জারা, দক্ষিণ ভারতের মালইয়ালী প্রভৃতি উপজাতিদের প্রধান ও প্রাথমিক জীবিকা স্থায়ী প্রথায় চাষ।

(৫) **হস্তশিল্প** (Handicraft)—কুটীর শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন উপজাতি জীবিকার্জন করে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। আসামের নাগা ও খাসীরা তাঁতের কাজ করিয়া থাকে। বিরহড় উপজাতি গাছের ছালের দড়ি তৈয়ার করে এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। পশ্চিমবঙ্গের মাহলীরা বাঁশের দল্‌মা ও ঝুড়ি বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সবর গোষ্ঠীর মহিলারা খেজুর পাতার চ্যাটাই বুনিয়া বাজারে বিক্রয় করে। বাস্তার রাজ্যের মারিয়া গণ্ডরা মদ তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে এবং গণ্ডরা লোহার কাজ, বেতের কাজ ও তাঁতের কাজ করিয়া থাকে। কড়ওয়া ও আগারিয়ারা বিভিন্ন ধরণের লোহার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে এবং কৃষি-জীবিদের বিক্রয় করে অথবা পরিবর্তে

খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করে। এইভাবে বিভিন্ন উপজাতি তাহাদের প্রধান কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করে।

দিন মজুর (Labour)—যে সমস্ত উপজাতি ভূমিহীন, কৃষিকার্যের জন্য কৃষিজমি পায়না অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে না তাহারা অপরের জমিতে খাটিয়া অথবা কোন শিল্পে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের দিন মজুর বলে। সুতরাং মজুর দুই ধরনের : (ক) কৃষি মজুর (খ) শিল্প মজুর।

(ক) **কৃষি মজুর** (Agriculture Labour)—যাহারা অপরের জমিতে কৃষিকার্য করিয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে অথবা খাদ্যদ্রব্য মজুরী হিসাবে পায় তাহাদের কৃষি মজুর বলা হয়। এই মজুর শ্রেণী ঋতুভিত্তিক হইতে পারে অর্থাৎ ধান রোপণ (cultivation) এবং ধান কাটার (harvesting) সময় আসে আবার কাজ শেষ হইলে ফিরিয়া যায়। যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া প্রভৃতি উপজাতি বিহার ও উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গে ধান রোপণ ও কাটার সময় আসে এবং কাজের শেষে নিজ ঘরে ফিরিয়া যায়। যাহারা স্থায়ী মজুর অর্থাৎ যাহারা প্রতিবেশী জমিদার বা জোতদারের বাড়ীতে কাজ করে তাহাদের পারিশ্রমিক তিন ধরনের হয়, দৈনিক, মাসিক এবং বাৎসরিক। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কেরালা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, লোধা, গণ্ড প্রভৃতি সম্প্রদায় অনেকে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(খ) **শিল্প মজুর** (Industrial Labour)—যাহারা ভারী শিল্পে কাজ করিয়া মজুরী পাইয়া থাকে তাহাদের শিল্প মজুর বলে। শিল্পে যোগদান দুই উপায়ে হয়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিলে আদিবাসী কর্মীরা মজুর হিসাবে যোগদান করে। যেমন—দুর্গাপুর, ভিলাই, রুউড়কেলা প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো উপজাতি শিল্প মজুর হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। অন্য প্রকার হইল আসাম, উত্তরবঙ্গের চা বাগানে কাজ করার জন্য মধ্যভারত হইতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতি মজুর হিসাবে কাজ করিতেছে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই শিল্প শ্রমিকরা শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

রেলের মজুর বা আদিবাসী পুরুষ বা মহিলা জংগলের কাজ করে। কলিকাতা কর্পোরেশনে ধাঙড় বা আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত কিছু কিছু লোক কাজ করে। তাহাদের অনেকে আদিবাসী। ফরেষ্ট বিভাগে অথবা কনট্রাকটরের কাজেও দিন মজুরী পায়। মধ্য ভারতের করকু, অন্ধ্রপ্রদেশের চেনচুদের এক গোষ্ঠী সরকারের বন বিভাগে দিন মজুরী করে।

অন্যান্য পেশা (OtLer occupation): উল্লিখিত পেশা ছাড়া কোন উপজাতি সাপ খেলাইয়া, ভেল্কী নাচ দেখাইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পয়সা উপার্জন অথবা খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার শবর গোষ্ঠির মানুষ সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে এবং কাকমারা সম্প্রদায় ভেল্কী নাচ দেখাইয়া চাল ও পয়সা সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়াও বর্তমানে আদিবাসী সমাজে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা স্কুল কলেজে শিক্ষকতা, অফিসে আদালতে কেরানী এবং অফিসারের কাজ, পুলিশের কাজে যোগদান করিয়া জীবিকা অর্জনের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পথ হারাইয়া অনেক আদিবাসী অপরাধ প্রবণতার মধ্যেও জীবিকার সন্ধান খুঁজিয়া পায় প্রায় তিন শতাধিক গোষ্ঠীকে অপরাধ প্রবণ গোষ্ঠী হিসাবে বৃটিশ সরকার চিহ্নিত করিয়াছিল। তাহারা প্রাক্তন অপরাধ প্রবণ গোষ্ঠী (Excriminal tribe) বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন তাহারা বিমুক্ত জাতি (Denotified tribe) নামে পরিচিত।

ভারতীয় উপজাতির সমস্যা

(Problem of Indian Tribe)

উপজাতি বা আদিবাসীদের সমস্যা অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। মানুষ স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তথাপি সমাজ ও সংস্কৃতির খতিয়ানে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে অনেক বৈষম্য থাকিয়া গিয়াছে। সমতলবাসী প্রতিবেশী অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত উপজাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির বৈষম্য তাহারই

এক ধারা বহন করিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানর চেষ্টা হইয়াছে, কখনও বা সমস্যার উদ্ভব হইয়া সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। তদানিন্তন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উপজাতি সমস্যার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করেন নাই। উপরন্তু নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। বিভিন্ন সময় আইন প্রনয়ণ করা হয়, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মিশনারী ছাড়া অন্য কেহ প্রবেশ করিতে না পারে সেরকম ব্যবস্থাও তদানীন্তন বৃটিশ সরকার করিয়াছেন। এই আইন বা নিষেধাজ্ঞা বৃটিশ স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কোন কথা আসে না। উপরন্তু বৃটিশ শাসনের চাপে তাহারা পাহাড়ে বা জঙ্গলে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সমস্যার কারণ (Causes of problem): আদিবাসী সমস্যার নানা কারণ দেখা যায়। ইহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল—

(১) **বহিরাগতদের সহিত সংস্পর্শ**--মাঝে মাঝে বহিরাগতরা উপজতি অঞ্চলে প্রবেশ করিলে, তাহা উপজাতি গোষ্ঠীর মনে রেখাপাত করে, তাহাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

(২) **বহিরাগতদের দ্বারা বঞ্চনা**—ব্যবসায়ী, টাকা দাদনদার বা মহাজন গোষ্ঠীর লোকেরা অতি অল্প মূল্যের জিনিসপত্র দিয়া তাহাদের নিকট হইতে অতি মূল্যবান সম্পদ ঠকাইয়া লয়। ইহাতে তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নতুন মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

(৩) **বৃটিশ চিন্তাধারা**—বৃটিশ শাসন, আদিবাসী সমস্যার আর এক কারণ। যে সমস্ত বৃটিশ কর্তাব্যক্তিরা (Administrator) আদিবাসী অঞ্চলে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা সেই অঞ্চলের মানুষদের আচার-ব্যবহার, সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত নিজদিগকে একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারেন নাই উপরন্তু নিজদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা আদিবাসী জীবনে প্রভাব আনে।

(৪) **মিশনারীর প্রভাব**—ইংরেজ রাজত্বকালে আদিবাসী অঞ্চলকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যেখানে মিশনারী ছাড়া অন্যান্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসীদের খৃষ্ট ধর্মে পরিবর্তিত করা। এই পরিবর্তনের ফলে আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৫) **স্বতন্ত্রভাবে বসবাস**—আদিবাসীরা সাধারণতঃ অন্য মানুষের সংস্পর্শের বাহিরে জঙ্গলে বা গিরি কন্দরে বসবাস করে। ফলে অন্য মানুষের সঙ্গে কোন যোগ থাকে না, এবং তাহাদের জীবনযাত্রায় আদিম জীবনাবদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠে এবং নানা সমস্যা দেখা দেয়।

এছাড়া বৃটিশ সরকার আইন করিয়া সমস্ত বনজঙ্গল সংরক্ষণ করিয়া দেওয়ার ফলে আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক কাঠামোয় আঘাত আসে। জঙ্গলের গাছপালা কাটা, বন্য পশুপক্ষী শিকার, ফলমূল, মধু সংগ্রহ সংরক্ষণ করিবার ফলে, যাহারা কেবল বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে তাহাদিগকে জঙ্গলচ্যুত হইতে হয়। অসহায় অবস্থায় জঙ্গলের বাহিরে বাসস্থান তৈয়ারী করে; কিন্তু অর্থ নৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য নানাবিধ অসামাজিক কাজের মধ্যে নিজদিগকে নিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গের লোধা উপজাতি হইল একটি প্রধান উদাহরণ।

আদিবাসী গোষ্ঠীর অনেকে নিজ বাসভূমি বা চাষের জমি হারাইয়াছে; যে সমস্ত আদিবাসী, সমতলভূমির চাষের উপর নির্ভরশীল বর্তমানে তাহাদের চাষের জমি নানাভাবে হস্তচ্যুত হইয়াছে। প্রতিবেশী মানুষ টাকা ধার দিয়া অল্প মূল্যে অধিকাংশ জমি গ্রাস করিয়া লইয়াছে। ফলে আদিবাসীরা ভূমিহীন হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় কাজ করার পদ্ধতি না জানায় অপরের হাতে জমি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে কেন্দ্র করিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা খাদ্য সংগ্রহকারী গোষ্ঠী, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ নীতির ফলে তাহাদের বনে জঙ্গলে শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, ফলে অর্থ নৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। স্থানান্তর প্রথায় চাষের ফলে একদিকে যেমন বনজ সম্পদ নষ্ট হয়, অপরদিকে বনজসম্পদ সংরক্ষণের ফলে সেই চাষও বন্ধ হইয়া যায়। অপরদিকে এই চাষ লাভজনক নয়। আবার যাহারা স্থায়ী প্রথায় চাষ করিয়া থাকে তাহারা পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে এবং প্রাচীন কৃষি যন্ত্রপাতি দ্বারা চাষ করিয়া থাকে বলিয়া উৎপাদন হ্রাস পায়।

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনে নানা সমস্যা দেখা যায়। যখনই তাহারা অন্য সংস্কৃতির মানুষের সংস্পর্শে আসে, তখনই সেই সংস্কৃতি আদিবাসী জীবনে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে নিজেদের

সংস্কৃতির ভালর দিকটাও ক্রমশঃ হারাইতে বসিয়াছে এবং অন্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করিতে গিয়া নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ধর্মীয় জীবনেও বিশেষভাবে খ্রীষ্টান মিশনারীরা নানা কৌশলে আদিবাসীদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আসাম উপজাতিদের মধ্যে ইহা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক আদিবাসীগোষ্ঠী অশিক্ষায় জর্জরিত। এখনও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট ঘটে নাই। ভারতবর্ষে আদিবাসীদের শিক্ষিতের হার মাত্র ১১·৩০% এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮·৯২%। সুতরাং এই অশিক্ষার সুযোগ লইয়া অনেকে তাহাদের ঠকাইবার চেষ্টা করে।

বেশীরভাগ আদিবাসীগোষ্ঠী বনে জঙ্গলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। সেই সকল অঞ্চলে যে সমস্ত রোগ দেখা দেয় তাহার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিবারণের ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় গাছ-গাছড়া, গাছের মূল, তুক-তাক, যাদু বিশ্বাসের উপর। ইহাতে রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতে হয়। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতি কেন্দ্র না থাকায় চিকিৎসার সমস্যা দেখা দেয়।

ইহারা সাধারণতঃ দুর্গম স্থানে বনে, বাস করে। সেখানে যাতায়াতের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা নাই। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যোগাযোগ ও গমনাগমনের জন্য নির্ভর করিতে হয় পায়ে হাঁটিয়া। ইহা তাহাদের নিকট আর এক প্রধান সমস্যা।

সমাধানের (Solution) উপায় :

কয়েকটি মতামত—সরকারী প্রচলিত রীতি, নীতি ও সংবিধান (Constitution) অনুযায়ী যাহারা পিছিয়ে পড়া মানুষ (back ward) বা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ (weaker section) তাহাদের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে প্রত্যেক রাজ্যের (State) উপর ভার ন্যস্ত করা হয়। সংবিধানে বলা হইয়াছে "The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যের কর্তব্য হইতেছে যাহারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ

বিশেষ করিয়া যাহারা তপশীলী জাতি ও উপজাতি তাহাদের প্রতি অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিকে বিশেষ যত্ন লওয়া, তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও শোষণ হইতে মুক্ত রাখা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জোর দিয়াছিলেন যে, "The present need is for quick implementation of whatever has been decided". অর্থাৎ যাহা কিছু ঠিক করা হইয়াছে তাহা যেন তাড়াতাড়ি কার্যকরী হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্ররূপে উন্নয়নের জন্য নানা জায়গায় "Sub-Plan" অর্থাৎ ছোট ছোট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। (রিপোর্ট—1976, 3)

বর্তমানে উপজাতিদের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ, শাসকগোষ্ঠীর নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমস্যা মোকাবিলা করিতে গেলে উপজাতিদের ইতিহাস ও সমাজ জীবন জানা প্রয়োজন। বৃটিশ শাসনকালে মিশনারীরা ইহাদের সংস্পর্শে আসে। পরবর্তী কালে ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী ইহাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। অনেক সমাজসেবী এই দুর্বলশ্রেণীর পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং তাহাদিগকে বৃহত্তর সমাজের সহিত মিলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁহারা এই উপজাতি মানুষগুলিকে ভারতীয় মানবগোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বহু সমাজ-সংস্কারক, জাতীয় রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সেবী, নৃ-বিজ্ঞানী এই আদিবাসী গোষ্ঠীর সমস্যার কথা চিন্তা করেন এবং তাহাদিগকে অখণ্ড ভারতবর্ষে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সহিত এক করিয়া দেওয়ার সূত্র আবিষ্কার করেন। সুতরাং সমস্যা সমাধানের উপায়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) **স্বাতন্ত্র্যকরণ** (Segregation)
  (ক) স্বাধীনতার পূর্বে (Pre-Independence)
  (খ) স্বাধীনতার পর (Post-Independence)

(২) **আত্মীকরণ** (Assimilation)

(৩) **সমন্বয়করণ** (Integration)

(১) **স্বাতন্ত্র্য করণ:** ভারতীয় উপজাতি গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে ইহাদের সমস্যা সমাধান হইতে পারে এই বিশ্বাস অনেকের মনে দীর্ঘমূল।

(ক) স্বাধীনতার আগের যুগ (Pre-Indepenience): বৃটিশ

শাসকগোষ্ঠী উপজাতি গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার চেষ্টা করে। তাহাদের জীবন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদাসীন। এই সকল আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কেবলমাত্র বৃটিশ আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী, মহাজন, সরকারী কর্তাব্যক্তি ছাড়া কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। ইহাতে উপজাতিদের সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল কারণ তাহারা ঐ সকল ব্যক্তিদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ইহা ছাড়াও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী কোন কোন আদিবাসী অঞ্চলকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল। বৃটিশ শাসকের উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা। কিন্তু তাহার ফল দেখা যায় অনুরূপ। কেবলমাত্র কয়েক লক্ষ নাগা লইয়া ১৯৬০ সালে নাগাল্যাণ্ডের জন্ম। ইহা তাহাদের পক্ষে উপকারই সাধিত করিয়াছিল। India Act বা ভারত বিধি অনুযায়ী উপজাতি স্বতন্ত্রকরণ আইন কার্যকরী করা হয় ১৮৭০ সালে। এই আইন অনুযায়ী আদিবাসী অঞ্চলকে "তপশীলী অঞ্চল বা Scheduled Tracts"-রূপে চিহ্নিত করা হয়। ইহারা যথাক্রমে (ক) হিমালয় অঞ্চল—আসাম, দার্জিলিং, কুমায়ুন, তরাই অঞ্চল ইত্যাদি। (খ) মধ্যাঞ্চল—ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, চন্দা, ছত্রিশগড় ইত্যাদি (গ) পশ্চিম ভারত—পাঁচমহল, খান্দেশ, ইত্যাদি। (ঘ) দক্ষিণ ভারত—বিশাখাপত্তনম, গোদাবরী, লাক্ষাদ্বীপ। ইহা ১৮৭৪ সালে তপশীলী জেলা আইনরূপে সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৯১৯ সাল পর্যন্ত নানা নীতি স্থির হয়। এই নীতিগুলি মোটামুটি প্রায় সবই "তপশীলী অঞ্চল" বা "তপশীলী জেলা" নীতির অনুরূপ। তবে নূতন কিছু যোগ করিয়া অথবা বাদ দিয়া স্থির করা হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় সম্বলপুরকেও তপশীলী অঞ্চলের আওতায় আনা হয় কিন্তু ছত্রিশগড়, চন্দা, মির্জাপুর, জনসর-বাওয়ার প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয়। মণ্টাগো এবং চেমসফোর্ড তাহাদের রিপোর্টে "পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বা Backward tract" সম্বন্ধে কিছু পরিবর্তন করিতে বলেন। সীমা চিহ্নিত করার ফলে আদিবাসী জীবনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। স্বীয় অবগুণ্ঠনের মাঝে নিজদিগকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। ইহাতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দেখাইতে চাহিল, স্বতন্ত্র অঞ্চল চিহ্নিত করার ফলে আদিবাসীগোষ্ঠী অনেকখানি উপকৃত হইতেছে। সেইজন্য ১৯৩৫ সালে পুনরায় নূতন নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহা যথাক্রমে বহির্ভূত অঞ্চল Excluded

Areas" এবং আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বা Partially Excluded Areas" যাহা ১৯৩৬ সালে ৯১ ও ৯২ ভারত সরকারের বিধিরূপে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি ধারা দুই রকম ভাবে কার্যকরী হয়।

(ক) গভর্ণর নিজের দায়িত্বে "বহির্ভূত অঞ্চলে" কাজ করিবেন কিন্তু আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে মন্ত্রীদের উপদেশ অনুযায়ী করিবেন।

(খ) উল্লেখ্য প্রথম অঞ্চলে গভর্ণর নিজ দায়িত্বে সমস্ত খরচ করিবেন কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে খরচ করা হইবে।

(গ) বহির্ভূত অঞ্চলের যে কোন উপদেশের জন্য গভর্ণরকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

১৯৩৯ সালে ভেরিয়ার এলুইন (Elwin, 1939: 511—519) "ন্যাশন্যাল পার্ক" স্থাপনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিলেন এবং অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা যায় তাহার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। পুনরায় ১৯৪১ সালে "স্বতন্ত্রকরণ" নীতিকে প্রকট-রূপে বৃহত্তর ভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য সমর্থন জানাইয়াছিলেন। স্বতন্ত্র করার উদ্দেশ্য আদিবাসী জীবনের উপর যাহাতে বাহিরের কোন কৃত্রিম ছাপ না পড়ে তাহারা যেন নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বন্ধনে নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করিতে পারে।

স্বাধীনতার পরের যুগ (After Independence): স্বাধীনতার প্রারম্ভে ভারত সরকার আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্রকরণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তবে আগের নীতির কিছুটা পরিবর্তিত রূপ এবং তাহা আদিবাসী কল্যাণকে (welfare) অনুসরণ করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা তাহাদের পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছিল, সেইজন্যই তাহারা নাগারাজ্য, মেঘালয় রাজ্য দাবী করার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত সরকারের উপদেষ্টা ভেরিয়ার এলুইন, তাঁহার "ন্যাশন্যাল পার্ক" নীতিতে আদিবাসীদিগকে "যাদুঘরের নিদর্শন" (museum specimen) এবং ভারতীয় শাসনকার্যের প্রতীক হিসাবে রাখার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার মতের পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমরা আদিবাসীদিগকে যাদুঘরের প্রতীক হিসাবে রাখিতে চাই না এবং তাহাদের উন্নতিতে, অগ্রগতির পথে বাধা দিতে চাই না ও তাহারা ঠিক ভাবে চালিত হউক। আমরা তাহাদের বন্য যাযাবর ও নীচ শ্রেণীতে ফেলিতে চাই না।"

ইহার পর শতকরা পঞ্চাশজনের বেশী আদিবাসীর বসতি রহিয়াছে এই রকম জেলা বা তালুক বা পরগণাকে "তপশীল অঞ্চল এবং আদিবাসী অঞ্চল" রূপে ঘোষণা করা হয় এবং এ. ভি. ঠাক্কারকে লইয়া একটি উপসমিতি তৈয়ারী হয়, যে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। নানা ধরনের বঞ্চনা থেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা বা সেফ্ গার্ড (Safe-guard) তৈয়ারী করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই আইন কার্যকরী করা হয় "আদিবাসী" এবং "তপশীলী অঞ্চল" ঘোষণার মাধ্যমে। কিন্তু এই নিয়মের কিছু ভুল থাকিয়া যায় কারণ সরকারী কাজকর্ম সমস্তই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যাহারা এই অঞ্চলের বাহিরে বাস করিত তাহারা এই আইনের আওতার মধ্যে আসে নাই।

"তপশীল উপজাতি" কথাটি ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। অবশ্য ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে "আদিম অধিবাসী (Primitive Tribe)" কথাটি লওযা হয় এবং সেইভাবে তালিকা করা হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় ধারাতে "পিছিয়ে পড়া উপজাতি" (Backward Tribe) বলিয়া স্থির করা হয়। ১৯৩৬ সালের সরকারী আদেশ অনুযায়ী আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের কয়েকটি উপজাতিকে "পিছিয়ে পড়া" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী "উপজাতি"-রূপে পৃথকভাবে নির্বাচিতকরা হয় এবং পৃথকভাবে সংখ্যা গণনা করা হয়। সংবিধানের ৩৪২-এর ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে এক আদেশ জারি করেন এবং কয়েকটি উপজাতিকে তপশীলী উপজাতিরূপে ঘোষণা করেন। এই তালিকার ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালে পুনর্বিন্যাস ও সংশোধন করা হয়।

আদিবাসীদিগকে তপশীল ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হইতেছে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগকে কল্যাণের (welfare)-এর মাধ্যমে উন্নীত করা। "পিছিয়ে পড়া মানুষ, যাহারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর, তাহাদের সরকারী সাহায্যে উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নাম তালিকাভুক্ত করা এবং তাহারাই হইল তপশীলী জাতি বা উপজাতি"। **Article 342 lays down that "the President may by public notification, specify the tribes or tribal communities or part of or groups**

within tribes or tribal communities or parts which shall for the purpose of this constitutions deemed to be Scheduled Tribes......". According to this provision, President of India has specified these communities through constitution (Scheduled Tribes order) 1950, S. R O. 510.

৩৪২ ধারাতে বলা হইয়াছে যে, "রাষ্ট্রপতি জনসাধরণের প্রতি বিজ্ঞাপন জারি দ্বারা, উপজাতি বা উপজাতিগোষ্ঠীকে অথবা গোষ্ঠী অংশকে, বিধিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত করিলে তাহারা তপশীলী উপজাতি হিসাবে গণ্য হইবে। এই নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এই গোষ্ঠীগুলিকে ১৯৫০ সালে ৫১০ এস. আর. ও ধারাতে তপশীলী উপজাতি হিসাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন"।

তপশীল ভুক্ত করিয়া উপজাতিদিগকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা এবং কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীকেই কল্যাণের আওতায় আনা হইল তপশীল করার উদ্দেশ্য।

২। **আত্মীকরণ** (Assimilation): আত্মীকরণ হইতেছে এক পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠী মানুষের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যখন মিলিয়া মিশিয়া যায়। ইহাতে উপজাতিদের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ উপজাতি গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে চায় এবং তাহাদের বহি-জগৎ সম্বন্ধে ধারণা অল্প। আত্মীকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপক (ক্রোবার ১৯৪৮: ৪২৮) বলিয়াছেন, "সাধারণতঃ আমরা আত্মীকরণে আশা করিতে পারি যখন কোন সমাজের বহির্দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং সমাজ যখন প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ও ইহার সংস্কৃতি প্রগতিশীল হয়।"

ভারতবর্ষে উপজাতি এবং প্রতিবেশী অন্যান্য হিন্দুধর্মাবম্বলী মানুষ দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পরস্পরকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং উপজাতিরা ক্রমে ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুদের মত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে এবং কোন কোন সময় মিশনারীদের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়া খ্রীষ্টানদের মত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে আসার ফলে উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয় এবং নূতন সংস্কৃতির জন্ম হয় ফলে নূতন সংস্কৃতিভাবাপন্ন উপজাতিতে

পরিবর্তিত হয়। এই রকম উপজাতির সংখ্যা ভারতে বিরল নয়। অধ্যাপক ঘুরে (Ghurey ১৯৬৩: ২৩) উপজাতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমতঃ হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতি। যেমন—মধ্যপ্রদেশের রাজ গণ্ড। দ্বিতীয়তঃ স্বল্প হিন্দুভাবাপন্ন, যেমন লোধা, ভূমিজ, মুণ্ডা। তৃতীয়তঃ পাহাড়ী শাখা যেমন খাশা ইত্যাদি। আত্মীকরণ পদ্ধতি বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অধ্যাপক মজুমদার (১৯৫৭: ১০১) ভারতীয় উপজাতিদের প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন (i) প্রকৃতপক্ষে আদিম (ii) হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিবাসী (iii) সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জীবনাদর্শে রূপান্তরিত আদিবাসী। এলুইন (১৯৪৩) আদিবাসীকে মূলত চারিটি ভাগে বিচার করেন। (i) অত্যন্ত আদিম (ii) ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং বাহিরের সহিত সীমিত সম্পর্ক রাখিয়া জীবন যাপন (iii) উপজাতি হইতে বিচ্যুত হওয়া (iv) আভিজাত্য উপজাতি। দুবে (১৯৬০) আদিবাসীদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন। (i) আদিবাসী যাহারা নির্জন পরিবেশে বাস করে। (ii) আদিবাসী শ্রেণী যাহারা গ্রামজীবনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া বাস করে। (iii) আদিবাসী যাহারা গ্রামে অন্যান্য জাতির সহিত বাস করে। (iv) আদিবাসী যাহারা হরিজন অস্পৃশ্যরূপেবাস করিতে থাকে। (v) উপজাতি যাহারা উচ্চমানের সামাজিক জীবন যাপন করে।

উপরি-উল্লিখিত শ্রেণী বিভাগ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতীয় উপজাতির জীবনে সংস্কৃতির আত্মীকরণ নানাভাবে হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস ইহাকে "সংস্কৃতকরণ" (Sanskritization) বলিয়াছেন, অধ্যাপক নির্মল বসু (১৯৫৩) ব্রাহ্মণ প্রভাবান্বিত বলিয়া ইহাকে ব্রাহ্মণীকরণ (Brahmanization) বলিয়াছেন। ১৯৬৫ সালে সুরজিত সিংহ জাতি-উপজাতি সমন্বয়" (continum) ভূমিজদের ক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন এবং ইহাকে "ক্ষত্রিয় করণ" (Kshatriyaization) বলিয়াছেন। মহাপাত্র (১৯৬৮) উড়িষ্যা উপজাতি যেমন ভুঁইয়া, গন্দ, খন্দ প্রভৃতিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। মোহনগৌতম (১৯৭৩) সাঁওতাল জীবনের হিন্দু প্রভাবকে অস্বীকারের উদাহরণ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেজন্য "সাঁওতালী করণ" (Santalization) বলিয়াছেন।

এই সকল বিষয় হইতে দেখা যায় নানাভাবে হিন্দু গোষ্ঠীর প্রভাবের ফলে উচ্চ জাতি, অথবা নীচুজাতি উদ্ভব হয়।

অধ্যাপক ঘুরে আদিবাসীদিগকে পিছিয়ে পড়া হিন্দু বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি দেখাইয়াছেন রাজ-গণ্ডরা, হিন্দু কৃষিজীবী মানুষের ন্যায় সমান স্তরে এমনকি ব্রাহ্মণরাও তাহাদের নিকট জল খায়। উত্তর-পশ্চিমের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা হিন্দু জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। থারু (শ্রীবাস্তব—১৯৫৮) খাশা (মজুমদার—১৯৬২), লোধা (ভৌমিক: ১৯৬২) প্রভৃতি সকলে হিন্দুদের মত জীবন যাপন করে।

অধ্যাপক ভৌমিক পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভূমিজ, লোধা, শবর, রাজবংশী, বাউড়ী, বাগ্‌দী প্রভৃতি তথাকথিত গোষ্ঠীগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত, এক জাতি (caste) বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী রাখে। দীর্ঘ সহাবস্থানে উপজাতি সমাজে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাকে উপজাতি বিলুপ্ততা (Di-Tribalisation) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সাঁওতালদের 'সাফা হড়' আন্দোলনের মাধ্যমে চিরাচরিত সাঁওতালী উপজাতীয় জীবনযাত্রার কোন কোন রীতিকে অপবিত্র, অশুচি বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকে। সাফা অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার আন্দোলনই 'সাফা হড়' আন্দোলন। ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে যে ভকত (ভক্ত) আন্দোলন ঘটে, তাহাতে হিন্দু অনুপ্রবেশ বা আর্যীকরনের উদাহরণ পাওয়া যায়। ঠিক এমনিভাবে মুণ্ডাদের মধ্যেও আন্দোলন হইয়াছে বিরশা মুণ্ডার অভ্যুত্থানে। বিরসাকে তাহারা বিরসা ভগবান বলিয়া অভিহিত করে। আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্রমান্বয়ে হিন্দুয়ানীর পথে আগাইয়া যাওয়া ও আদিমতা পরিত্যাগই হইল এই নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদ। লোধা উপজাতি নিজেদের শবর অর্থাৎ রামায়নে বর্ণিত অরণ্যচারীর গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত করিবার গর্ব রাখে। তাহারা শীতলা ও চণ্ডীর পূজা করে, হিন্দুদের মত ব্রাহ্মণ পূজক দ্বারা নয় নিজেদের দেউড়ী বা দেহেরী দ্বারা শীতলা বা চণ্ডীর পূজা করে। কেবল পাঁঠা নয় মুরগীও বলি দেয় তাদের প্রীতি সাধনের জন্য। উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা হিন্দুদের নিকট প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাদের জীবন যাত্রার প্রতিটি ছন্দে এই আর্য্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহাকে আর্যীকরণ (Aryanisation) বলিয়া অভিহিত

করা হয়। অধ্যাপক ভৌমিক আদীবাসী জীবনে নূতন মানসিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরকারী আনুকূল্যে সুযোগ সুবিধা পাইয়া আদীবাসীদের অনেকে আদিবাসী সংস্কৃতিতে স্থায়ী ভাবে স্বাতন্ত্র্য সুখ পাইতে চান। ফলে আদিবাসীদের বিশেষ বিশেষ রীতির প্রবর্তন ঘটাইয়া নাচগান, ভাষার প্রবাহ আনিয়া আদিবাসী হিসাবে পৃথকরূপে গণ্য হইতে চান। ইহাই **আদিবাসীমন্যতা** (Re-tribalisation : Bhowmik : 1975)

মধ্য ভারতের হো দের (মজুমদার ১৯৫০, রায় ১৯৬৭) কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। কিন্তু সমস্তই দীকু (Dikkus) অর্থাৎ হিন্দু প্রতিবেশীদের হইতে লওয়া। কোলেরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। করকু ও বইগারা হিন্দুদের শাখা রাজ-করকু এবং বিনজারা বলিয়া পরিচয় দেয়। কোন কোন ভীলেরা হিন্দু বলিয়া দাবী করে এবং তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়।

দক্ষিণ ভারতের উপজাতিরা আত্মীকরণ হইতে বাদ যায় না। লুইজ (১৯৬২ : ১২) বিশ্বাস করেন খুব দ্রুত হিন্দুভাবাপন্ন চলিতেছে। কেরালা প্রদেশের উপজাতিরা হিন্দু নাম ব্যবহার করে, হিন্দু উৎসব পালন করে এবং হিন্দু মন্দির দর্শন করে। আইয়াপ্যান লাক্ষাদ্বীপের উপজাতিদের কখনও উপজতি বলেন না বরং তাহাদের পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী মফলাসদের সঙ্গে এক করিয়া ফেলেন।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিরা অন্যান্য প্রতিবেশী গ্রাম্য মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মীকরণ ঘটিয়াছে এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন সাধিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। ফলে তাহাদের সমস্যা নূতন রূপ লইয়াছে অর্থাৎ উন্নতমানের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

সমন্বয়করণ (Integration) : আদিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সমস্যা সমাধানের এক উপায়, অর্থাৎ আদিবাসীদের জীবনপ্রবাহের সহিত মিল রাখিয়া এবং পরিবর্তিত না করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই হইবে সমন্বয় সাধন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হইল "বিভিন্নমুখীকে একত্রিত করণ", "Unity in diversity". এই মূল তত্ত্বকে

ভিত্তি করিয়া সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্, নৃ-বিজ্ঞানীগণ এবং সরকারী পরিচালকগোষ্ঠী একত্রিত হইয়া আদিবাসীদের জীবনপ্রবাহের সহিত সমতা রাখিয়া কাজ করিলে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে।

পরলোকগত জহওরলাল নেহেরু (১৯৫৮ : xiii) এই প্রসঙ্গে "পঞ্চশীল (Panchsheel)" পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ আদিবাসী উন্নয়নের জন্য পাঁচটি মূল বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন।

(১) "আদিবাসীদের উন্নতি করিতে হইবে তাহাদের নিজেদের প্রতিভার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পের উপর জোর দিয়া উৎসাহ দান করিতে হইবে।

(২) আদিবাসীদিগকে জঙ্গল ও ভূমির উপর অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(৩) তাহাদের উন্নতির জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া উন্নয়নের কাজে লাগাইতে হইবে।

(৪) তাহাদের উপর পরিকল্পনার অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়া এবং আদিবাসী অঞ্চলের উপর অতিরিক্ত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া তাহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইনিষ্টিটিউশন-এর মাধ্যমে কাজ করিতে হইবে।

(৫) ফলের জন্য আমাদের বিচার করা উচিত পরিসংখ্যান বা টাকা খরচের মাধ্যমে নয়, মানুষের কি পরিমাণ চরিত্র গঠন হইয়াছে তাহার উপর।"

'পঞ্চশীল' পরিকল্পনা হইতে সহজেই বোঝা যায় (i) আদিবাসীদের উপর জোরপূর্বক বোঝা চাপান চলিবে না। (ii) প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট শোষণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। (iii) আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আদিবাসী অফিসার নিয়োগ করিয়া আদিবাসী অঞ্চলের উপর কাজ করিতে হইবে এবং তাহা নৃ-তাত্ত্বিকভিত্তিক হইবে। (iv) অতি সহজ ও সরল পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। (v) আদিবাসীদের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে।

শ্যামাচরণ দুবে (১৯৬৮ : ১১০) বলিয়াছেন ভারতবর্ষের আদিবাসী সংস্কৃতি এক নয়, নানা সংস্কৃতির সমন্বয় এই ভারতবর্ষ। সেখানে তিনি আদিবাসীদের

আচার ব্যবহার রীতি-নীতিকে "একক" করিয়া দেখেন নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি। সুতরাং তিনি স্বতন্ত্রভাবে আঞ্চলিক ভাগ করিয়া (Regional national setting) নিজস্ব প্রতিভার উপর ভিত্তি করিয়া উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে (i) একমুখী শাসন (Singleline administration) (ii) অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জেলাতে ভাগ (Comparatively small districts) (iii) আঞ্চলিক উন্নয়ন (বিদ্যার্থী, ১৯৭৪ : Area Development approach) প্রভৃতি নানা ভাবে উন্নয়নের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাব-প্ল্যান দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্য আরম্ভ করা হয়। সেইজন্য নাগাল্যাণ্ডকে সাতটি জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশের বাস্তারকে দুইটি জেলায় (যেমন রায়পুর যাহা কমিশনার কর্তৃক শাসিত হয়) এমনকি বিহারকেও বিভিন্ন জেলায় ভাগ করা হয়। যাহাতে উন্নয়নের পথে সহায়ক হয়।

সমস্যা সমাধানের ব্যবহারিক উপায় (Some Practical Solution) : আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য যদিও স্বাতন্ত্র্যকরণ, আত্মীকরণ ও সমন্বয়করণের প্রয়োজন, তথাপি ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া, সমস্যা সমাধানের কয়েকটি ব্যবহারিক পন্থা প্রয়োজন :

(১) **অর্থনৈতিক**—প্রত্যেকেরই ধারণা আদিবাসীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং প্রাচীন অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহাদের সহিত অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নতিশীল প্রতিবেশীর মত অগ্রসর করাইয়া দেওয়াই হইবে সমস্যা সমাধানের এক উপায়।

(২) **সম্পত্তি আইন দ্বারা কার্যকরী করা**—অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিবেশী-গোষ্ঠী আদিবাসীদের নিকট হইতে কৌশলে অথবা স্বল্প মূল্যে সম্পত্তি ঠকাইয়া লইয়াছে। বর্তমানে যদিও ভূমি-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু তাহা সার্বিক কার্যকরী হয় না, তাহাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষার জন্য এখনও কার্যকরী করিতে পারে না, উপরন্তু তাহারা অপরের নিকট বঞ্চিত হইতেছে। ইহার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা ঠিক মত ভূমি বিতরণ করিয়া ভূমিহীন আদিবাসীদের ভূমি দেওয়াই হইবে সমাধানের আর এক পথ।

(৩) **কৃষি-উন্নয়ন**—কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। ইহা ছাড়াও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষের পরিবর্তে উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রণালী স্থাপন করিতে হইবে। প্রাচীন চাষের যন্ত্রপাতির পরিবর্তে উন্নত ধরনের আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে হইবে!

(৪) **অরণ্য সংরক্ষণ আইনের পরিবর্তন**—প্রকৃতপক্ষে অরণ্য সংরক্ষণ আইন শিথিল করার আবশ্যক। বহু আদিবাসী যাহারা এখনও জঙ্গলে বাস করে তাহারা বনজ সম্পদের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং আইনের মাপকাঠিতে বনজ সম্পদ না রাখিয়া, এমন ভাবে আইন করার প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে যেন বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয়।

(৫) **শিক্ষার উন্নয়ন**—ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষ শিক্ষায় অনগ্রসর। অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ও অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র ও আবাসিক ছাত্রাবাস স্থাপনের মাধ্যমে তাহাদিগকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানই হইবে সমাধানের উপায়। এই বিষয়ে সরকার যথেষ্ট আগ্রহশীল।

(৬) **চিকিৎসার সুযোগ**—স্বতন্ত্রভাবে বাস করার জন্য বর্তমান উন্নত ধরনের চিকিৎসা হইতে আদিবাসীরা বঞ্চিত। তাহাদিগকে নানা ধরনের ব্যাধিতে ভুগিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগকে উন্নত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থাই হইবে ব্যাধি সমস্যা সমাধানের এক উপায়।

(৭) **আদিবাসী শিল্প উন্নয়ন**—প্রত্যেক আদিবাসী প্রকৃতপক্ষে তাহারা জন্মগত শিল্পী। তাহারা দেওয়ালে নক্সা অঙ্কন, বা নানা ধরনের কুটীর শিল্প যেমন তাঁতের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও লোহার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া শিল্পী মনের পরিচয় দেয়; কিন্তু এইগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এইগুলি পুনর্জীবিত করা এবং উন্নত প্রথায় বৃহত্তর আকারে প্রসারিত করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সেইজন্য ইহাদিগকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা দেওয়া বা অর্থ সাহায্যের দ্বারা কিছুটা সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

(৮) **যাতায়াতের ব্যবস্থা**—গমনাগমনের জন্য উন্নয়ন সাধন একান্ত প্রয়োজন। আদিবাসী অঞ্চলে যাতায়াতের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা নাই সুতরাং রাস্তাঘাট তৈয়ারী করিয়া ইহার সুযোগ করা যাইতে পারে।

(৯) সুষ্ঠ বোঝাপড়া—সমস্যা সমাধানের জন্য এবং তাহার ফল লাভের জন্য প্রথমেই দেখিতে হইবে যেন তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর কোন আঘাত না আসে এবং ইহার দ্বারা তাহারা বিব্রত ও বিভ্রান্ত না হয়। তাছাড়া নৃ-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী, সরকারী অফিসারদের ঐ সমস্ত মানুষদের সহিত সহজ ও সরল সমঝোতা থাকিবে তাহা না হইলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

এ সম্বন্ধে জহওরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, প্রথমতঃ আদিবাসীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের মনবল শক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের সমাজ ও সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষার উন্নয়ন করিতে হইবে। তাহাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করিতে হইবে এবং সমানভাবে তাহাদের কল্যাণের সুযোগ দিতে হইবে।

যাহা হউক ঐ সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইলে আদিবাসী কল্যাণ সার্থক হইবে।

আদিবাসী কল্যাণ (Tribal welfare)

আদিবাসী কল্যাণের অর্থ হইতেছে ভারতবর্ষের সমগ্র পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর উপজাতি যাহাদের স্বতন্ত্র বসবাস, সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা, সহজ ও সরল অর্থনৈতিক জীবন, প্রাচীন সংস্কৃতি ভাবাপন্ন, শিকার বা খাদ্য আহরণের দ্বারা জীবনযাপন, স্থায়ী কৃষিজীবীর জন্য জমি ও চাষের যন্ত্রপাতি হইতে বঞ্চিত, যাহাদের মধ্যে পানীয় জলের অভাব, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, শিক্ষায় অনগ্রসর ও শোষিত মানুষ, এক কথায় দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, তাহাদের সকল প্রকার সাহায্যের দ্বারা সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করার ব্যবস্থাকে বলা হয় **আদিবাসী কল্যাণ (Tribal welfare)**। আমাদের দেশ সার্বভৌমিক গণতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই আদিবাসীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন।

আদিবাসী কল্যাণের পদ্ধতিকে নানা চিন্তাশীল ব্যক্তি নানা ধরনে ভাগ করেন। মজুমদার (১৯৬০)-এর অভিমত ভারতবর্ষে

আদিবাসীদের তিনটি অঞ্চল আছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা সুতরাং ইহাদের কল্যাণের মাধ্যম হইবে দুই ধরনের: (ক) সংস্কার মাধ্যম (Reform Approach) (খ) শাসন সংক্রান্ত মাধ্যম (Administrative Approach)। সংস্কার মাধ্যমের মধ্যে সমাজ সংস্কারকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শাসক গোষ্ঠী ও নৃ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা এই কাজ চলিবে। নৃ-বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান পদ্ধতি, সমাজ সংস্কারক ও শাসক গোষ্ঠীর কাজের সহায়তা হইবে। তিনি বলেন প্রত্যেক অঞ্চলের প্রয়োজন এবং মানুষের চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত। এস. সি. দুবের (১৯৬০) অভিমত আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য কল্যাণের মাধ্যম (Welfare Approach) হইবে বিজ্ঞান সম্মত অথবা রাজনৈতিক সম্মত। সমাধানের প্রস্তুতিকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করেন। (ক) সমাজ সেবা মাধ্যম (Social Service Approach) (খ) রাজনৈতিক মাধ্যম (Political Approach)। (গ) ধর্মীয় ভাবাপন্ন মাধ্যম (Religious Approach) (ঘ) নৃ-বিজ্ঞান সম্মত মাধ্যম (Anthropological Approach) পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সেবক সংঘ নৃ-বিজ্ঞান সম্মত মাধ্যমে সমাজ সেবা করে। এই সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসী অঞ্চলে তাহাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক বিষয়ক মাধ্যমকে স্বাধীনতার পূর্ব এবং স্বাধীনতার পরের যুগ এই দুইটি পর্যায়ে ভাগ করেন। স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরের যুগে আদিবাসী দিগকে এক করা হয়। ধর্মীয় ভাবধারার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করিয়া উন্নয়নমূলক কাজ হয়। নৃ-বিজ্ঞান মাধ্যম হইবে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসীর কল্যাণসাধন।

অধ্যাপক বিদ্যার্থী দুবের অভিমতকে স্বীকার করেন, এবং 'তাঁর মতে আদিবাসী কল্যাণ হইবে চারিটি পর্যায়ে, (১) নৃ-বিজ্ঞানীদের মাধ্যম (Anthropologist's Approach) (২) সমাজ সেবকদের মাধ্যম (Social worker's Approach) (৩) মিশনারীয় মাধ্যম (Missionaries Approach) (৪) আদিবাসী কল্যাণের জন্য শাসক গোষ্ঠীর মাধ্যম (Administrative machinery for Tribal Welfare)। বিভিন্ন অভিমত থেকে সহজেই বোঝা যায় আদিবাসী কল্যাণকে পাঁচটি ভাগে

ভাগ করা যায় তাহারা যথাক্রমে (১) রাজনৈতিক মাধ্যম (Political Approach) (২) শাসন ব্যবস্থার মাধ্যম (Administrative Approach) (৩) ধর্ম সংক্রান্ত মাধ্যম (Religious Approach) (৪) স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার মাধ্যম (Voluntary Approach) (৫) নৃ-বিজ্ঞান মাধ্যম (Anthropological Approach)।

(১) রাজনৈতিক মাধ্যম (Political Approach)—আদিবাসী কল্যাণকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। স্বাধীনতার পূর্বের যুগ, এবং স্বাধীনতার পরের যুগ। স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসীদিগকে যে ভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছিল অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করার জন্য নানাদিক থেকে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। কারণ এই চিন্তাধারাতে আদিবাসীদের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পরের যুগে আদিবাসী কল্যাণের জন্য সংবিধানে (Constitution) বিশেষ ধারা বলবৎ করা হয়, তাহাদের স্বার্থ রক্ষার (Safe guard) জন্যে। প্রথমে দশ বৎসরের জন্য ১৯৫০ সালে প্রথম আইন করা হয় কিন্তু দেখা যায় এই দশ বৎসরে আশানুরূপ অগ্রসর হয় না সুতরাং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। যে সমস্ত বিশেষ ধারা প্রণয়ন করা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে আদিবাসী স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া তৈয়ারী করা হয়। প্রথমতঃ ৩৪২ ধারাতে তপশীলী উপজাতি রূপে আদিবাসীদিগকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। ইহাই সংবিধানে স্বীকৃত। ইহার পর ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪ ধারাতে উপজাতিদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হয়। ৩৩৫ ধারাতে চাকুরীর আসন সংরক্ষিত করা হয়। ৩৩৮ ধারাতে বিশেষ আধিকারিক বা অফিসার নিযোগ করা হয়। ৩৩৯ ধারাতে আদিবাসীদের আয়ত্তে রাখার আইন এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সকল ধারা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়। ইহা বর্ধিত করিয়া ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পৌছায়। পরে তাহা ১৯৯০ সালের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত ধারাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে সংবিধানের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য পরিবেশন করেন (Scheduled Tribes order 1950) তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে সাতটি আদিবাসীর নাম ছিল যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, লেপচা, ভুটিয়া, মেচ এবং ম..। বাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে "দি

সিডিউল্ড কাস্ট এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার এ্যাক্ট (Ammendment) অনুযায়ী সাতটি আদিবাসী ছাড়া আরও অনেকগুলি গোষ্ঠীকে তপশীলভুক্ত করা হয় তাহাদের মধ্যে হো, কোড়া, লোধা, খেরিয়া বা খাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া, ভূমিজ, চাকমা, গারো, হাজং, মগ, মাহালি, নাগেসিয়া এবং রাভা প্রধান। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর সিডিউল্ড ট্রাইবস্ মডিফিকেশন যে অর্ডার ১৯৫৬ সালে প্রবর্তন করা হয় তাহাতে আরও অনেকগুলি গোষ্ঠীকে তপশীলভুক্ত করা হয়। পরে ১৯৭৬ সালের দি সিডিউল্ড কাস্টস এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডারস (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীর সংখ্যা আটত্রিশ।

সংবিধানের বিধি বা ধারা অনুযায়ী তপশীলী উপজাতিদের স্বার্থ নানা ভাবে রক্ষা করা হয়। তাহাদের চাকুরী স্থলে বয়সের সীমা বর্ধিত করা হয়, শিক্ষার মান শিথিল করা, অভিজ্ঞতার স্তর শিথিল করা, চাকুরীর উন্নতির জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র শিথিল করা, নানা ভাবে তাহাদের কল্যাণের জন্য রক্ষা-কবচ (Safe guard) লওয়া হয়।

(২) **শাসনব্যবস্থার মাধ্যম** (Administrative Approach)—যে ভাবে শাসন সংক্রান্ত বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে রাজনৈতিক বিষয় অনুসরণ করিয়াই করা হইয়াছে। ভারত সরকার আদিবাসী কল্যাণের জন্য নানাভাবে শাসনব্যবস্থার সাহায্যে (Administrative machinary) গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা বা সেফ্-গার্ড-এর কথা আলোচনা করা হইয়াছে বর্তমানে আদিবাসী কল্যাণের জন্য যে পরিমাপক (measure) পদ্ধতি লওয়া হইয়াছে তাহাতে জাতীয় নেতা, সমাজসেবক, বয়স্কআদিবাসী এবং ফলিত নৃ-বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের মতামত লওয়ার ব্যবস্থা আছে। কি ভাবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করা যাইবে তাহার সমস্ত দায়িত্ব ভারতের রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে এবং তিনিই ইহার জন্য দায়ী। তিনি তাঁহার কাজের সুবিধার জন্য একজন প্রধান অধিকর্তা (Director General) নিযুক্ত করেন যাঁহার কাজ আদিবাসীদের জন্য যে সকল সেফ-গার্ড লওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তত্ত্বাবধান করা এবং তিনি কাজের সহায়তার জন্য আঞ্চলিক অধিকর্তা (Regional Director) নিযুক্ত

করেন। প্রধান অধিকর্তা, আঞ্চলিক অধিকর্তার সহযোগিতায় আদিবাসী কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৮ ধারা অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন কমিশনার নিয়োগ করেন। তাঁহার প্রধান কাজ তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে বিভিন্ন রক্ষা আইন আছে তাহা ঠিকমত কার্যকরী হইয়াছে কি না লক্ষ্য করা এবং সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে তথ্যাদি প্রেরণ করা। বর্তমানে ভারতবর্ষে দশজন সহ-কমিশনার নিযুক্ত আছেন।

আদিবাসী উন্নয়ন ও আদীবাসী কল্যাণের কার্যধারা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৪৯ সাল হইতে '৭০ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক অধিবেশনে একজন চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিবেশিত হয়। ১৯৪৯—৫০ সালে আয়েঙ্গার, ১৯৫৩-৫৫ সালে কাকা কালেলকর, ১৯৫৮-৫৯ সালে রেণুকা রায়, ১৯৫৯-৬০ সালে ভেরিয়ার এলুইন, ১৯৬০-৬১ সালে ধেবর, ১৯৬০-৬১ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ, ১৯৬১-৬২ সালে ভারগাভা, ১৯৬৫ সালে গোফুর, ১৯৬৫-৬৬ সালে মালকান, ১৯৬৭ সালে এম. আর. ইরাডি প্রভৃতিদের নেতৃত্বে নানা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তপশীলী উপজাতিদের কল্যাণের নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

প্রত্যেক রাজ্যের আদিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যপালের। তাঁহার বদলে মুখ্যমন্ত্রী এবং আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী আদিবাসী কল্যাণকে কার্যকরী করিবেন। যে সকল রাজ্যে আদিবাসী সংখ্যার আধিক্য সেখানে স্বনির্ভর আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্থাপিত হইয়াছে। সংবিধানের (Constitution) পঞ্চম তালিকা (Fifth schedule) অনুযায়ী আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইটি কার্য্যনির্বাহক সমিতি স্থাপিত হয়—আদিবাসী উপদেষ্টা সমিতি (The Tribes' Advisory Council) এবং আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র (Tribal Cultural Research Institute)। এই সমিতির কাজ আদিবাসী কল্যাণ পরিকল্পনার কাঠামো ও পরিকল্পনা তৈয়ারী করা এবং আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সরকারকে উপদেশ দেওয়া। এই সকল বিষয় কার্যকরী করার জন্য এবং রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগাযোগের জন্য একজন উপ-অধিকর্তা (Deputy Director) নিযুক্ত আছেন। এই রকম সমিতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৫৫ সালে সাংস্কৃতিক গবেষণাগার (Cultural Research Institute) স্থাপিত হয়। আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণা, পুস্তক রচনা, বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মূল্যায়ন করা এবং আদিবাসী সম্পর্কে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রভৃতি হইল এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজ।

এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে সমাজ সেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য (Social worker) ১৯৬২ সালে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

১৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে আলাদাভাবে একটি তপশীলী উপজাতি কল্যাণ বিভাগ (Tribal Welfare Department) স্থাপিত হইয়াছে। এই রকম বিভাগ বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক রাজ্যে উপজাতি কল্যাণ বিভাগের জন্য একজন (Director) নিয়োজিত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গে তপশীলী ও আদিবাসী কল্যাণের জন্য ১৯৫২ সালে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ স্থাপিত হয়। কলিকাতা সদর দপ্তর ছাড়াও জেলায় জেলায় তাহাদের দেখাশুনা করার জন্য বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করা হয় এবং এই বিভাগ তপশীলী জাতি ও উপজাতির উভয় শ্রেণীর দেখাশুনা করার জন্যই স্থাপিত হয়।

৩। **ধর্মীয় মাধ্যম** (Missionary Approach)—স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসীদের কল্যাণ কেবল মাত্র মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে এইরকম মিশনারী কয়েকটি সেবাকেন্দ্র আছে। যাহারা উপজাতিদের নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, লুথারিয়ান ওয়ার্ল্ড সারভিস, আর্যসমাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ব্রাহ্মসমাজ, ভীল সেবা মণ্ডল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আদিবাসী কল্যাণের জন্য তৎপর।

মিশনারীরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া বিহার, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উত্তর উড়িষ্যা, মধ্য ভারত, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও উত্তর পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে একদিকে তাহাদের কল্যাণের জন্য সাহায্য করিয়াছে অপরদিকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ১৯৫৫

সালে লুথেরিয়ান মিশন ছোটনাগপুর অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, ১৯৮৫—৮৬ সালে ক্যাথলিক মিশন ছোটনাগপুর অঞ্চলে সি. লেভিন্‌স্‌-এর নেতৃত্বে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর মধ্য ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভীল, গণ্ড, খাড়িয়া প্রভৃতিদের কল্যাণ-এর উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। খাসী, নাগা, গারো প্রভৃতিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি আদিবাসী অঞ্চলে কল্যাণমূলক কাজ করিতেছে। অর্থনৈতিক সাহায্য, খাদ্য সরবরাহ, জলসেচের ব্যবস্থা, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং চিকিৎসার জন্য বিবিধ ওষুধ সরবরাহ এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈয়ারী ইত্যাদিতে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি লিপ্ত আছে।

(৪) **স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম** (Voluntary Approach) —স্বাধীনতার পর নানা সেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ সেবী, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজে আগাইয়া আসেন। ১৯৪৭ সালের পর সরকার যে সমস্ত আদিবাসী কল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা প্রথমতঃ সমাজ সেবীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী।

সে সমস্ত সেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান ও প্রথম স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে "ভারতীয় আদিমজাতি সেবক সংঘ" এবং ইহার সভাপতি ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। এই সংস্থার অধীনে ছোট বড় ১৮টি সংঘ কাজ করিত। ১৯৫০ সালে সংঘের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টি। এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমাধানের জন্য কল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি বিষয় লইয়া পুস্তক, পত্রিকা, ইস্তাহার প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

অন্যান্য সর্বভারতীয় সংঘের মধ্যে "ভারতীয় ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস লীগ" "সারভ্যান্টস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি", "ইণ্ডিয়ান রেড্‌ ক্রস্‌ সোসাইটি","অল্‌ ইণ্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ ফেডারেশন" এবং "অল্‌-ইণ্ডিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার" প্রভৃতি হইল প্রধান। এই সকল সংস্থা ভারতীয় আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত আছে।

বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল সেবামূলক সংস্থা আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল বিহারে "বিহার আদিম জাতি সেবা মণ্ডল" "সাঁওতাল পাহাড়িয়া সেবামণ্ডল", উড়িষ্যায় "উড়িষ্যা আদিবাসী কংগ্রেস" পশ্চিমবঙ্গে "সমাজ সেবক

সংঘ", "আদিবাসী কল্যাণ সমিতি"। ইহা ছাড়া প্রায় সকল রাজ্যেই যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি রাজ্যসরকার হইতে অনুদান পাইয়া আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য, বিদ্যালয় আবাসিক ছাত্রাবাস, চিকিৎসা কেন্দ্র, কৃষি শিক্ষার জন্য জমি, নানাধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত করিতেছে। অনেক সময় সর্বভারতীয় সংস্থাগুলি হইতেও সাহায্য পাইয়া থাকে। সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরের স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের সেবামূলক কাজের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে অনেক সময় আদিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজনের সহিত এক হইতে না পারার জন্য সমস্যার সঙ্গে কাজ এক হইতে পারে না। ফলে কল্যাণের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক সংঘের কাজ হইবে প্রয়োজন ভিত্তিক কাজ।

(৫) নৃ-বিজ্ঞান সম্মত মাধ্যম (Anthropological Approach)—আদিবাসী কল্যাণের জন্য নৃ-বিজ্ঞান মাধ্যমে (Approach) প্রথমেই আলোচনার বিষয় হইবে আদিবাসীদিগকে স্বতন্ত্র করার পদ্ধতি। ঠাক্কার বাপা আদিবাসীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাদের কল্যাণের বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে ইহাতে কল্যাণের তুলনায় তাহাদের সমস্যার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের আত্মীকরণ (Assimilation)-এ বিশ্বাসী। তাঁহারা আদিবাসীদিগকে বৃহত্তর সমাজের সহিত মিশাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। ভেরিয়ার এলুইন 'আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক মন্তব্য রাখিয়াছেন।

১৯৪৯ সালের স্বাধীনতার পর নৃ-বিজ্ঞানীগণ আদিবাসী কল্যাণের জন্য ফলিত নৃ-বিজ্ঞানের (Applied Anthropology) কার্যকারীতার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁহারা আদিবাসী কল্যানের জন্য নৃ-বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং "পরিকল্পনা মূলক সাংস্কৃতিক মিশ্রণ" (Planned Acculturation)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৫৩ সালে বিহারের রাঁচি জেলার লোহারডাগা শহরে সর্বভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী সম্মেলন হয় তাহাতে আদিবাসী-দের সমস্যা আলোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মজুমদার (১৯৫৮), দুবে (১৯৬০),

চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৯), বোস (১৯৬০), বিদ্যার্থী (১৯৬০), ভৌমিক (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধান ও আদিবাসী কল্যাণকে ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এরকম প্রায় ১১টি গবেষণা কেন্দ্র এবং গবেষণাকে সুষ্ঠভাবে পরিকল্পনা করার জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠান আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব বিভাগ বর্তমান আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমাধানের পথ বাহির করিবার জন্য গবেষণা কাজ করিতেছে। নৃ-বিজ্ঞানীগণ আদিবাসী কল্যাণের জন্য কয়েকটি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :

(১) আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(২) আদিবাসীদের শিল্প বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়গুলি উন্নয়নের জন্য সমস্যাগুলি প্রথমে জানা প্রয়োজন।

(৩) আদিবাসী জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করার বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৪) তাঁহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের মধ্যে কম বেশী আঞ্চলিক বাধাগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৫) তাহাদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সমস্তাগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

(৬) পরিচালক গোষ্ঠীদিগকে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের কাজের কোন অসুবিধা না হয়।

(৭) আদিবাসীদের জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আদিবাসী কল্যাণের সূত্র আবিষ্কারের প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে।

(৮) আদিবাসী কল্যাণকে ফলপ্রসূ করার জন্য পরিচালক গোষ্ঠী, নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী প্রভৃতিদের সদাসর্বদা সতর্কতার সহিত পরিদর্শন করিতে হইবে এবং যে সকল বিষয়ে সামাজিক বাধা আসিবে তাহাদিগকে দূর করিতে হইবে। সুতরাং আদিবাসী কল্যাণ হইবে, আদিবাসীদের পুরাতন সংস্কৃতির উপর আঘাত না করিয়া এবং তাহাদিগকে যাদুঘরের নমুনা (Museum Specimen) হিসাবে না দেখিয়া, তাহাদের স্বভাবশীল উন্নয়নে বাধা না দিয়া এবং যাহা একমাত্র সম্ভব তাহাদের

প্রকৃতিগত সংস্কৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরিমাপমত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কল্যাণ কার্যকরী করার পদ্ধতির উপর।

আদিবাসী উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা (Planning for Tribal Development.) :—

স্বাধীনতার পর দুর্বল শ্রেণীর (Weeker section) মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য মানুষের সহিত সমন্বয় সাধন করার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য যে সকল ব্যবস্থা লইয়াছে তাহা কমিশনার ফর সিডিউল্ড কাস্ট এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইব রিপোর্ট ১৯৫০ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহারা যথাক্রমে "ব্যাকওয়ার্ড-ক্লাশ কমিশন ১৯৫৫", "ষ্টাডি টিম অন্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার অফ্ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ ১৯৫৯", "কমিটি অন্ স্পেশাল মাল্টিপারপাস্ ট্রাইব্যাল ডেভালপ্মেণ্ট ব্লক ১৯৬০", "সিডিউল্ড এ্যারিয়াজ এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ কমিশন ১৯৬০-৬১" "স্টাডি গ্রুপ্ অন্ দি ওয়েলফেয়ার অফ্ দি উইকার সেক্শন অফ্ দি ভিলেজ কমিটি ১৯৬১, সেমিনার এমপ্লইমেণ্ট অফ্ সিডিউল্ড কাস্ট এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ ১৯৬৪" "দি কমিটি অন্ ট্রাইবাল্ ইকনমি ইন্ ফরেস্ট এরিয়াস্ ১৯৬৭" "দি স্টাডি টীম অন্ ট্রাইব্যাল্ ডেভালপ্-মেণ্ট প্রোগাম্ ১৯৬৯", "দি টাস্ক্ ফোর্স্ অন ডেভালপ্মেণ্ট অফ্ ট্রাইব্যাল এরিয়াজ ১৯৭৩" এবং রাজ্য সরকারের অনেক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় (Safeguard) জন্য নানা আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Sub-plan গ্রহণ করা হয় যাহাতে সমস্ত পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা যায়। পরিশেষে ইন্‌টিগ্রেটেড্ ট্রাইব্যাল ডেভালপ্মেণ্ট প্রজেক্ট (I.T.D.P.) গ্রহণ করা হয়। সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। **অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ; যোগাযোগ, গৃহনির্মাণ, সমাজ-সংস্কৃতি ;** এবং **রাজনৈতিক**। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তালিকার মধ্যে ধরা হয়, চাষের জমি, সেচ, কুটীর শিল্পের জন্য ঋণ, চরকা, শস্যভাণ্ডার, চাকুরীর জন্য আসন সংরক্ষিত করা ইত্যাদি। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে সেইমত কাজ হয় নাই।

ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মধ্যে কি পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল।

ভারতবর্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ (কোটি) হিসাব

পরিকল্পনা	সময়	মোট খরচ	তপশীলী উপজাতির জন্য খরচ	মোট খরচের %	উপকৃত তপশীলী উপজাতি সংখ্যা
প্রথম পরিকল্পনা	১৯৫১-৫৬	১,৯৬০	১৯.৪৭	০.৮৩	২.২৫
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১৯৫৬-৬১	৪,৬৭২	৪৮.৮৬	০.৮৭	২.৬২
তৃতীয় পরিকল্পনা	১৯৬১-৬৬	৮,৫৭৭	৫২.৫৫	০.৬১	২.৯৯
চতুর্থ পরিকল্পনা	১৯৬৯-৭৪	১৫,৯০২	৭৫.০০	০.৪৭	৩.৮০
পঞ্চম পরিকল্পনা	১৯৭৪-৮৯	৫৪,৪১১	১০৫.০০	০.২২	৪.১১
			*৫০০.০০	০.৯২	৪.১১

*৫০০ কোটি টাকা পাহাড়ী আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে খরচ হয়।

১৯৫৬, ১৯৬৬ সালে প্রতি পাঁচ বৎসরে ৩২.৭৩ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪ সালে তিন বৎসরে ২৭.০৯ কোটি টাকা খরচ বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সাব-প্ল্যান (১৯৭৮-৮৩)
অর্থনৈতিক সাহায্য (লক্ষ) হিসাব

	পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য ব্যবস্থা		ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাব	
বিষয়	রাজ্য পরিকল্পনা	কেন্দ্র কর্তৃক সহযোগিতা	রাজ্য পরিকল্পনা	কেন্দ্র কর্তৃক সহযোগিতা
১। কৃষি	৬০০·০০	২১১·০০	১৫০৩·০০	৩০০·০০
২। সেচ	১২৮৯·০০	১৫৬·০০	৩৭৯৪·০০	৬১৪·২৫
৩। সমবায়	৬০·০০	৫১·০০	৬১·০০	৩৬৭·৫৬
৪। বনজসম্পদ	১২৫·০০	৫৯·০০	৮৫৩·২৪	৪২৮·৫২
৫। পশুপালন	১০০·০০	৫৮·০০	৪০·৪২	২৭৮·৭৫
৬। গ্রামীণ শিল্প	১০০·০০	৪৯·০০	১৭০·১১	১৭৫·০০
৭। মৎস্য	—	—	১৯·০০	৭৬·০০
৮। শক্তি	১২৫·০০	—	৩৫০·০০	—
৯। গৃহনির্মাণ	১০০·০০	—	৪১০·০০	৩০০·০০
১০। রাস্তাঘাট	৪৮০·০০	৩০·০০	১০০০·০০	১০০·০০
১১। পুষ্টিকর-খাদ্য	৩৭৫·০০	—	৪৮·০৬	—
১২। ভারী শিল্প	—	—	৩১৬·৫০	—
১৩। স্বাস্থ্য	১৫১·০০	১৫·০০	৭৫০·০০	৫০·০০
১৪। পায়খানা ও জনস্বাস্থ্য	১১৬·০০	২০·০০	১৯৩·০০	৫৫·০০
১৫। শিক্ষা	২৪৮·০০	৬৫·০০	৭৫৩·৮৭	৭০·০০
১৬। যুব সংঘ	—	—	৯২·০০	—
১৭। জাতি ও উপজাতি কল্যাণ	১৮২·০০	৫·০০	৭৩৪·৬০	১০০·০০
	৪০৫০·০০	৭১৯·০০	১১০৮৯·৩০	৩৩৩১·২৩

আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণ

(Programmes and Schemes for Tribal Development)

বস্তুকেন্দ্রিক ও অর্থনৈতিক উন্ননের জন্য যে বিষয়গুলি পরিকল্পনার আওতা আনা হইয়াছে সেগুলি হইল গৃহনির্মাণ, কৃষি উন্নয়ন, সেচ, পশুপালন ও মৎস্য চাষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বনজসম্পদ, সমবায়, ঋণ, শিল্প এবং শক্তি।

গৃহনির্মাণ : ভারতবর্ষে যে সকল আদিবাসী ভবঘুরে, যাযাবর, যাহাদের কোন স্থায়ী বসতি নাই তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেদিনীপুর জেলায় আউলিগেড়িয়া, ঢোলকাট এবং ডহরপুর এই তিনটি গ্রামে ৯০টি পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ৪৫টি পরিবারকে যথাক্রমে ডহরপুরে ১০টি, ধানশোলায় ৩৫টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়াও মেদিনীপুরের বীনপুর থানায় ৩০টি খেড়িয়া পরিবার ও বাঁকুড়া জেলার মুকুটমনিপুর গ্রামের ৩০টি খেড়িয়া পরিবারের জন্য ও পুরুলিয়া জেলায় ভুপতিনগর গ্রামের ১৬টি বীরহড় পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার ছোটনাগদনা ও ডুমুরিয়া গ্রামে ১০০টি সাঁওতাল পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য সরাসরি সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় অপরাধ প্রবণ উপজাতি ২২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যার খণ্ড উপজাতি, বিহারের মালপাহাড়িয়া ও হাইদ্রাবাদের বায়ারলুটি ও নাগালুটি গ্রামে ১০০ চেনচু পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের গৃহ নির্মাণের জন্য নগদ টাকা, করগেট্ সীট্ ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হইয়াছে যাহাতে নিঃস্ব অসহায় উপজাতি তাহাদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করিতে পারে।

কৃষিজমি—আদিবাসী সমাজে ব্যক্তি মালিকানা কৃষিজমি যদিও দেখা যায় তথাপি জমি সাধারণতঃ সর্বসাধারণের বলিয়া বিবেচিত হয় এবং গ্রামের সমস্ত জমি গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা গ্রামের প্রধানের উপর পরিচালনার ও মালিকানার দায়িত্ব থাকে। এই রকম জমি বণ্টন ব্যবস্থা সাঁওতাল পরগনা এবং বাস্তার রাজ্যে দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলেও ইহা খুব সাধারণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন কোন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কিছু ধরনের জমি গ্রামের সর্বসাধারণের বলিয়া বিবেচিত হয়। এবং উত্তরাধিকারী হওয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন স্থানে জমি সুদখোর, জমিদার এবং শিল্পের আওতায় চলিয়া গিয়াছে। বিহারে এইভাবে হাজার একরের মত জমি সুদখোর দাদনদারের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ইহার ৫০ একরের মত জমি বিহার সরকার উদ্ধার করিয়া আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। এই রকম অবস্থা প্রত্যেক রাজ্যেই দেখা যায়। যাহাতে আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরিত না হইয়া যায় সেই জন্য নানা ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২ সালে ল্যাণ্ড রিফরম্ এ্যাক্ট গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বর্গা অপারেশন এ্যাক্ট গৃহীত হয় যাহাতে পুনরায় তপশীলী উপজাতিরা জমি ফেরৎ পায়। আসামে ১৯৬৪ সালে আসাম ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড রেভিনিউ রেগুলেসন (এ্যামেণ্ডমেণ্ট), ১৯৬৯ বিহার সিডিউল্ড এ্যারিয়াজ রেগুলেসন, ইত্যাদি প্রত্যেক রাজ্যেই ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয় যাহাতে ভূমিহীনরা ভূমি পাইয়া থাকে।

কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়—ভারতবর্ষের আদিবাসীর শতকরা ৭০/৮০ জন চাষের উপর নির্ভরশীল এবং তাহা খুবই আদিম প্রথায়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২৭০০০ পরিবার স্থানান্তর প্রথায় চাষে নির্ভর ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৮,২৩১টি পরিবারকে স্থায়ী প্রথায় চাষে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুই একর চাষের জমি, বীজের জন্য নগদ টাকা, গোবাদি পশু এবং চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইয়াছে। রাজস্থানে আদিবাসী অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ধান ও গম উৎপাদন করার জন্য বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে। উন্নত ধরনের চাষের লাঙ্গল ব্লকের মাধ্যমে সাহায্য করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে লোধা ও খেড়িয়াদের স্থায়ী কৃষিজীবী করার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে দুই একর জমি

দুইটি করিয়া বলদ, বীজ, সরবরাহ করা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বেয়ারলুটি অঞ্চলে ১০০ পরিবারকে উন্নয়নের আওতায় আনা হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি, দুইটি করিয়া বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। ৫০০ একর জমি ক্রয় করার জন্য ১০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

জলসেচ—পাহাড়ী অঞ্চলে জমিতে সেচের উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে সেচের জন্য কয়েকটি বিশেষ পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে। ইহার বিশেষ কার্যকারিতা দেখা যায় রঁাচি জেলায়, বান্দু ও তামার অঞ্চলে। ছোট ছোট খাল ও কুঁয়া দ্বারা জল সরবরাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। মহীশূরে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪,০০০ ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশে সেচ পরিকল্পনায় পাম্প মেসিন ক্রয় করার জন্য টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে মেসিন ক্রয় করার জন্য ৭৫% টাকা সরবরাহ করা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের চেঞ্চু ও পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের জন্য পুকুর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং বিভিন্ন জায়গায় কূপ খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আদি-বাসীরা রবি ও খারিফ শস্যে জলসেচ করিতে পারে।

পশুপালন ও মৎস্যচাষ—উপজাতিদের মধ্যে শূকর ও মুরগী পালন প্রধান। কোন কোন রাজ্যে উন্নয়ন ব্লক হইতে গরু এবং মুরগী সরবরাহ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে লোধা, খেড়িয়াদের মধ্যে উন্নত ধরনের গাভী এবং ষাঁড় আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ হইতে দেওয়া হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের উন্নত ষাঁড় দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভাল জাতের গরু জন্মাইতে পারে।

আদিবাসীরা মাছ ভালবাসে। কিন্তু উন্নত প্রণালীতে মৎস্য চাষ করিতে অনভিজ্ঞ। সেইজন্য মৎস্য বিভাগ হইতে পুকুর সংস্কার করা এবং মৎস্য চাষের আওতায় আনা হইয়াছে। এই রকম মৎস্য চাষ বিহারে এবং কেরালা প্রদেশে নানা জায়গায় করা হইয়াছে।

বনজ সম্পদ—প্রকৃতি-নির্ভর উপজাতি মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন বেশীর ভাগই বনজ সম্পদ হইতে মিটাইয়া লয়। জঙ্গল হইতে ফলমূল সংগ্রহ করে এবং গাছ বা লতাপাতা দ্বারা ঘরবাড়ী তৈয়ারী করে। এমনকি যারা কৃষিজীবী তাহারাও বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

তাহারা পাতা, ফল, মধু, জ্বালানি কাঠ, জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। চেঞ্চু, বীরহড়, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের শতকরা ৯০ ভাগ, পাহাড়ী চাষী মালে, শতকরা ৬০ ভাগ, লোধা, শতকরা ৫০ ভাগ, স্থায়ী চাষী মুণ্ডা, সাঁওতাল, শতকরা ৪৫ ভাগ বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

১৯৫২ সালে বন্য সংরক্ষণ আইন করা সত্ত্বেও অরণ্যনির্ভর উপজাতি গোষ্ঠীকে তাহাদের প্রয়োজনের অধিকার দেওয়া হয়, যেমন কৃষি যন্ত্রপাতির কাষ্ঠ আহরণ, পশুচারণ, মাটি ও পাথর সংগ্রহ, ঘর তৈয়ারীর জন্য বাঁশ ও কাঠ সংগ্রহ, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার এবং খাদ্যের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে শ্রমিক সমবায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সমবায়ের মাধ্যমে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিতে পারে তাহা ছাড়াও জঙ্গল উন্নয়ন কাজে যোগ দিতে পারে। এই রকম সংস্থা অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

সমবায়—সমবায় সমিতি স্থাপন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে প্রধান প্রধান হইল, শস্যভাণ্ডার (Grain Gola) স্থাপন, বহুমুখী সমিতি (Multipurpose Society), বাজার ও খরিদ্দার সমিতি (Marketing-cum-Consumer Society), অরণ্য-নির্ভর মজুর সমিতি (Forest-Labour Co-operative Society) ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে ৩২টি শস্যভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই শস্যভাণ্ডারগুলিতে শস্য মজুত থাকিবে এবং তাহাদের প্রয়োজনে এখান হইতে শস্য গ্রহণ করিবে আবার শস্য উৎপাদন হইলে ঐ শস্য ফেরত দিতে হইবে। তাহা ছাড়াও বনজ সমবায় স্থাপিত হইয়াছে যাহার মাধ্যমে বনজ সম্পদ যেমন বিড়ি পাতা, সিল্ক, লাক্ষা, মধু সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিবে। এই রকম সমবায় মধ্যপ্রদেশে "আদিবাসী সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন", অন্ধ্রপ্রদেশে "উপজাতি সমবায় অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্পোরেশন" স্থাপিত হইয়াছে যাহাতে মহাজন-এর হাত হইতে রক্ষা পায় এবং উপযুক্ত মূল্য পাইয়া দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

শিক্ষা উন্নয়ন—এখনও পর্যন্ত উপজাতিরা শিক্ষায় অনগ্রসর। বর্তমানে (১৯৭১) ভারতবর্ষে উপজাতিদের শিক্ষার হার ১১'৩০ এবং পশ্চিমবঙ্গে

৮'৯২, লাক্ষাদ্বীপে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী প্রায় ৪১'৩৭ এবং অরুণাচল প্রদেশে শিক্ষার হার সর্বাপেক্ষা কম ৫'২০।

বর্তমানে শিক্ষার হার বর্ধিত করার জন্য নানাভাবে নানাদিক প্রসারিত করা হইতেছে। বর্তমানে প্রায় ৪৩ লক্ষ তপশীলী উপজাতি শিক্ষিত। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ লোকের প্রাথমিক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কেবলমাত্র ৩০ হাজার ব্যক্তি ম্যাট্রিক ও উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন। পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ১৫২৯ জন স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত।

প্রাথমিক শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে বিশেষ করিয়া বিহার, আসাম, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে। ১৯৬৯ সালে আদিবাসী কল্যাণ সরজমিনে তদন্ত করিবার জন্য যে নিরীক্ষক দল (Study team) তৈয়ারী করা হইয়াছিল, তাহাদের মতামত অনুযায়ী সাত দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এক মাইলের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, আশ্রম বিদ্যালয় এবং আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস স্থাপন যাহার সহিত কৃষিজমি থাকিবে যেখানে ছাত্র ও ছাত্রীরা কৃষিকাজ শিক্ষা করিতে পারিবে এবং বিদ্যালয়ের সহিত কারিগরী শিক্ষা, তাঁতের ও সেলাই-র কাজ, কাঠের কাজ, মাদুর বুননের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই রকম আশ্রম বিদ্যালয় বর্তমানে ভারতবর্ষে ৭৩৩টি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫৭টি আশ্রম বিদ্যালয় কেবলমাত্র তপশীলী উপজাতিদের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্রম ছাত্রাবাসের সংখ্যা ৩৫। মেদিনীপুর জেলার বিদিশায় এইরকম একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যাহা সমাজ সেবক সংঘ দ্বারা পরিচালিত। এই সংঘের অধীনে লোধাদের জন্য দুইটি আশ্রম ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস আছে, যেখানে ছাত্র ছাত্রীরা আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা অর্জন করিতেছে। এখানে পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত দুইটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (Balwadi) স্থাপিত হইয়াছে। আর রহিয়াছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যাহাতে বহু ছাত্রছাত্রী সরকারী ভাতা পায়।

ইহাছাড়া উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে এবং অবৈতনিক ছাত্রাবাসের সুযোগ দেওয়া হইতেছে যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে। আশ্রম ছাত্রাবাসে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে তাহাদের জন্য প্রত্যেক মাসে ৭৫ টাকা

দেওয়া হয় এবং যাহারা আবাসিক নয় এবং স্কুল ফাইনাল এর উপরে পড়াশুনা করে তাহাদের জন্য মাসে ৪০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা খরচের ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের তপশীলী উপজাতিরা যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারে তাহাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয় ইহার মধ্যে ৩০ জন তপশীলী জাতি ও ১০ জন উপজাতি।

শিল্প: খনি ও শক্তি—আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ভারী শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে যেমন দুর্গাপুর, রুরকেলা, রাঁচি, বকারো, ভিলাই, প্রভৃতি শিল্পে, শিল্প মজুর হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছে। মজুরের শতকরা ৩ ভাগ খনিতে কাজ করিতেছে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩৫৭টি "ভারতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" (Indian Technical Institute I.T.I.) গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৮টি এবং ৭৬৪১ জন শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে এবং প্রত্যেকে ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শিল্পগুলি হইল, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাইর কাজ, গুটিপোকা চাষ, হস্তশিল্প ও লাক্ষা ইত্যাদি। আদিবাসী অঞ্চলে হাইডেল শক্তির আওতায় আসার ফলে তাহারা হাইডেল শক্তির উপকারিতা পাইতেছে। এই রকম পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালডিহিতে একটি শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে যেখান হইতে তাহারা হাইডেল শক্তির উপকারিতা পাইয়া থাকে।

ঋণদাস—ভারতের আদিবাসীরা ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে ঋণ লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাহাদের দৈনন্দিন চাহিদা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চাহিদা পূরণ করিতে চড়া সুদে ঋণ করিতে হয় মহাজন, মুনাফাখোরদের নিকট। বেশীর ভাগ সময় সুদের দায়ে জমি বিক্রয় করিতে হয়। ঐ সকল মহাজন ও সুদখোরদের নিকট হইতে বাঁচার জন্য সরকার আইন করিয়াছেন। অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে "অন্ধ্রপ্রদেশ ডিবেট রিলিফ রেগুলেসন", বিহারে ১৯৬৯ সালে "বিহার সিডিউল্ড এ্যারিয়া রেগুলেসন", মধ্যপ্রদেশে ১৯৫৫ সালে "মধ্যপ্রদেশ সিডিউল্ড ট্রাইব ডেবিট্

রেগুলেশন" প্রভৃতি আইন বলবৎ করা হয়। যাহার দ্বারা অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এবং সুবিধামত কিস্তিতে ঋণ শোধ করিতে পারে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা—চিকিৎসা ব্যবস্থা ও খাবার জল সরবরাহের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৫৩·৫৩ লক্ষ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৮৩·১৪ লক্ষ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৪৭·৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে দুরান্তে আদিবাসী অঞ্চলে আয়ুর্বেদিক শাখা খোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার ফল হিসাবে দেখা যায় নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের মধ্যে ভি. ডি. ক্লিনিক কাজ করিতেছে।

অপরদিকে খাবার জলের সুব্যবস্থার জন্য কূপ, নলকূপ এমন কি ট্যাপ কল স্থাপিত করা হইয়াছে। এই রকম জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রত্যেক রাজ্যে যেমন ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে করা হইয়াছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা—আদিবাসী অঞ্চলে যাতায়াত এবং রাস্তা তৈয়ারীর উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয় না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাত্র ৩·১২ কোটি টাকা খরচ হয় ৪০০০ কি. মি. রাস্তা তৈয়ারীর জন্য এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭·২৯ কোটি, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫·১ কোটি টাকা খরচ হয়। ইহার মধ্যে আসাম সব থেকে বেশী অংশ পায়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য নানা এজেন্সি যেমন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, সেণ্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি সংস্থাগুলি রাস্তা তৈয়ারীর কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপজাতি সম্প্রদায়

খাদ্য অন্বেষণকারী গোষ্ঠী

চেঞ্চু (The Chenchu)

১৯৫৬ সালের তপশীলী জাতি ও উপজাতির পরিবর্তিত অর্ডার অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের চেঞ্চু গোষ্ঠী তপশীলী উপজাতি রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা খাদ্য অন্বেষণকারী গোষ্ঠী রূপে পরিচিত।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ইহারা সংখ্যায় মোট ১৭৬০৯ জন। ইহার মধ্যে ৯০৪২ জন পুরুষ এবং ৮৫৬৭ জন স্ত্রী।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ইহাদের উপর সমীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন হাইমেনডরফ্।

বাসস্থান—ইহাদের অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় দেখা যায়। বিশেষ করিয়া মহাবুবনগর, কারনুল এবং গুনটুর, অমরাবাদ প্রভৃতি জেলায় নাল্লামাল্লার গভীর অরণ্যে ইহাদের ঘন বসতি। এই অরণ্য ২০০০ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত যাহা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। নাল্লামাল্লা অরণ্য কুডাপ্যা এবং কারনুল জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে চেঞ্চুদের ঘন বসতি কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগই আচম্পেট তালুকে, কারনুল জেলার আতমাকুর তালুকে এবং গুনটুর জেলার পালনাদ তালুকে বাস করিতে দেখা যায়।

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত—চেঞ্চুদের আবাস অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা সবথেকে বেশী। তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইট হইতে ১১০° ফারেনহাইট পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৫·৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ৬১·২° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পাইতে থাকে ১০° থেকে ১৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত কমিয়া যায়। ফলে আবহাওয়া কিছুটা আরামপ্রদ হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে শীত আরম্ভ হয় এবং তাপমাত্রা ৪৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত নীচে নামিয়া যায়। শীতের

প্রথম তিন মাস খুবই সুন্দর, প্রকৃতপক্ষে এই সময় কোন বৃষ্টিপাত হয় না। এই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে। জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে। বৃষ্টির পরিমাণ ২৫"—৪৫"। অমরাবাদ উপত্যকায় বৃষ্টির পরিমাণ ৪০"।

উদ্ভিদ ও প্রাণী—নাল্লামাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম হওয়ায় গাছপালা ভাল জন্মায় না। ইহার ১৪০০ ফুট উচ্চে নানা জাতীয় গাছ জন্মায় যেমন চিরুমান্থু (Onogeissus Latifolia), চিক্‌রেণী (Abbizzia amara), পাচারী (Dalbergic paneiculata), বিল্লুদু (Chloroxylon swistenia) ইত্যাদি। উন্নত ধরনের গাছপালার মধ্যে টিক্, ভেঙ্গী (Photocarpus marsupium), নাল্লামাডি (Terminalia tomentosa), ইপ্পা (Bassia-latifolia), তেঁতুল এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ও পাখী দেখা যায়। যেমন ভল্লুক, বাঘ, বন্যবিড়াল, বন্য কুকুর, সম্বর, চিত্রল হরিণ, বন্য ছাগল, নীল-গাই, এ্যান্টিলোপ, বন্য শূকর ইত্যাদি। ময়ুর, বন্য মোরগ, টিয়াপাখী, ঘুঘু, পায়রা, কাঠঠোকরা প্রভৃতি পাখী এই অঞ্চলে দেখা যায়।

মাটির ধরন—এখানকার মাটি কালো, লাল বাদামী রঙের বালি মাটি।

মানুষ ও গঠন—নৃ-বিজ্ঞানী হাইমেনডরফ্ ইহাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করেন। ইহাদের উচ্চতা মাঝারি, পুরুষদের গড় উচ্চতা ১৬৩ সে. মি. যদিও ১৫৫ সে. মি. উচ্চতার মানুষও পাইয়াছেন। গায়ের রং কালো বাদামী হইতে খুব ঘোর তামাটে, চক্ষু বাদামী, কখনও কখনও কালো। চুল মোটা, চুলের গঠন ঢেউ খেলান হইতে কুঞ্চন, কয়েকজনের চুল ফ্রিজ্‌লি বলিয়া মনে হয়। দাঁড়ি গোঁফে চুলের প্রাচুর্য দেখা যায়। সারা শরীর চুলে ভর্তি

ভাষা—চেঞ্চুরা তেলেগু ও চেঞ্চু মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে, যদিও চেঞ্চুদের নিজস্ব ভাষা আছে। ইহাদের মাতৃভাষা চেঞ্চু। থার্সটনের মতে চেঞ্চুদের ভাষা তেলেগু।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

পেশা : খাদ্য সংগ্রহ—এখনও চেঞ্চুরা জঙ্গল হইতে খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। দল বাঁধিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানই ইহাদের স্বভাব। ফলমূল সংগ্রহ বলিতে বুঝায় বন্য ফলমূল, পাতা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি। তেঁতুল, মহুয়া ফুল, বিড়িপাতা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের জীবনের প্রধান জীবিকা। আগেকার দিনে তেঁতুল সংগ্রহই ছিল জীবিকার উপায়। এই সকল তেঁতুল পূর্বে সমতল ভূমির অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করিত কিন্তু বর্তমানে বিক্রয় সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে সমবায় কেন্দ্রগুলি লোক নিযুক্ত করিতেছে এবং- তাহাদের নিকট কমিশনের মাধ্যমে তেঁতুল সংগ্রহ করিতেছে। চেঞ্চুরা এইভাবে মুনাফাখোরদের নিকট হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

মহুয়া ফুল সংগ্রহ চেঞ্চুদের আর এক জীবিকা। এপ্রিল মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে সারা জঙ্গল মহুয়া ফুলে ভরিয়া উঠে এবং এই সময় স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে সকলে মিলিয়া প্রত্যহ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়া ফুল সংগ্রহে বাহির হয়। মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করিয়া দৈনন্দিন খাওয়া তাহাদের জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উদ্বৃত্ত মহুয়া ফুল প্রতিবেশী গোষ্ঠীর নিকট বিক্রয় করে। আবার ঐ ফুল দ্বিগুণ মূল্যে তাহাদিগকে ক্রয় করিতে হয়, অন্য ঋতুতে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, কারণ ইহারা নিজেরা মহুয়া ফুল মজুত রাখিতে জানে না।

মধু সংগ্রহ ইহাদের আর এক জীবিকা। মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহের সময়। যে কোন পূর্ণিমা তিথিতে মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। ২।৩ জন নিকট আত্মীয় মিলিয়া দল তৈয়ারী করে মধু সংগ্রহে বাহির হয়। সাধারণতঃ গাছের ডালে পাহাড়ের গুহাতে মধু-চাকের সন্ধান পাইলেই মধু সংগ্রহ করে।

শিকার—ইহারা খাদ্য অন্বেষণকারী এবং অরণ্যচারী গোষ্ঠী বলিয়া শিকারের উপর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। তীর ও ধনুক লইয়া শিকার করা তাহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। শিকারের বিষয়বস্তু হইল খরগোশ, হরিণ, বন্য ভেড়া, কাঠবিড়াল, গিরগিটি, ইগুয়ানা, ময়ূর, বন্য মুরগী, ঘুঘু ইত্যাদি। স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া শিকারে বাহির হয়। কখনও

কখনও অন্যান্য প্রতিবেশী মানুষদের লইয়া শিকারের দল তৈয়ারী করে। মার্চ হইতে জুন পর্যন্ত শিকারের উপযুক্ত সময়।

কৃষিকার্য—চেঞ্চুরা খাদ্য সংগ্রহকারী গোষ্ঠী সেইজন্য কৃষিকার্য তাহাদের বংশানুক্রমিক পেশা নয়। বর্তমানে আদিবাসী সমাজের মাধ্যমে তাহাদিগকে চাষের জমি, বলদ, গরুর গাড়ী, বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে। কিন্তু কারনুল মহাবুবনগর প্রভৃতি জেলায় দেখা গিয়াছে ঐ সকল চাষের জমি প্রতিবেশী অ-আদিবাসী গোষ্ঠীর নিকট জমায় দিয়াছে আবার কোন কোন সময় এমনভাবে জমা দিয়াছে যাহাতে চাষীরা অর্ধেক টাকা চাষের পূর্বে জমা দেয় এবং অর্ধেক টাকা শস্য কাটার পর জমা দেয়। আবার কেহ কেহ বর্গাচাষ হিসাবে চেঞ্চু মালিক অর্ধেক পায় এবং চাষী অর্ধেক পায়।

ইহারা কেহ কেহ বংশগত কিছু কিছু চাষ করিয়া থাকে। যে অঞ্চলে তাহারা পশুচারণ করে সেখানে তাহারা একখণ্ড জমি পছন্দ করিয়া লয় এবং পরে বাঁশের চাঁচুনি (Scraper) দ্বারা ঘাস কাটিয়া ফেলে এবং অন্যান্য জীবজন্তু হইতে ফসল রক্ষার জন্য বাঁশের বেড়া তৈয়ারী করে। ইহারা সাধারণতঃ ছড়ান পদ্ধতিতে (Drilling method) চাষ করে অর্থাৎ লাইন করিয়া গর্ত করে এবং প্রত্যেক গর্তে কয়েকটি করিয়া বীজ যেমন জোয়ার, মিলেট ও অন্যান্য শস্য দিয়া মাটি চাপা দেয় এবং বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং গাছ বড় হইতে থাকে। শস্য পাকিলে কাটিয়া আনে।

বনবিভাগের মজুর—দৈনন্দিন মজুরের কাজ করিয়া চেঞ্চুদের জীবিকা অর্জনের আর এক উপায়। তাহারা সরকারী বনবিভাগের মজুর খাটিয়া থাকে অথবা কনট্রাকটরের অধীনে কাজ করিয়া থাকে। বাঁশ, কাঠ, মধু, পাতা, মহুয়া ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বনবিভাগে অথবা কনট্রাকটরের নিকট জমা দেয় এবং মজুরী পাইয়া থাকে। বর্তমানে কনট্রাকটরের উপর বিশেষ আইন করা হইয়াছে। তাহারা চেঞ্চু মজুর ছাড়া কোন মজুর নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যদি অন্য মজুর নিযুক্ত করিতে চায় তাহা হইলে বনবিভাগের অনুমতি লইয়া নিযুক্ত করিতে হইবে। অনেক সময় কনট্রাকটররা দোকানের মাধ্যমে নগদ পয়সার বদলে খাদ্যদ্রব্য যেমন জোয়ার, চাউল, বার্লি, লঙ্কা, তেল, বিড়ি প্রভৃতি সরবরাহ

করিয়া থাকে। কখনও কখনও তাহাদের অগ্রিম মজুরী দিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করিয়া নগদ মজুরীতে মজুর নিযুক্ত বনবিভাগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে, কারণ কন্ট্রাক্টররা চেঞ্চু শ্রমিকের তুলনায় সমতলভূমির মজুরদের বেশী পছন্দ করিয়া থাকে, তাহাদের মতে চেঞ্চুরা অনিয়মিত হইয়া পড়ে এবং কাজের অসুবিধা হয়, কিন্তু বনবিভাগ চেঞ্চুদেরই নিযুক্ত করিয়া থাকে। চেঞ্চুরা যে অঞ্চলে বাস করে সেখান হইতে কাজের স্থান ৮।৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে তাহারা অল্পস্থায়ী ঘর তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে কারণ কাজের সময় ৯-৩০ হইতে ৩-৩০ পর্যন্ত এবং তাহাদের মজুরী নির্ভর করে কাজের তারতম্য অনুযায়ী। বাঁশের ছিল্‌কা তৈয়ারী করার জন্য মজুরী নির্দিষ্ট থাকে তিন থেকে ছয় টাকা। ইহা ছাড়াও বেড়া তৈয়ারী, চারাগাছ রোপণ করা প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করা হয়। এক একর চারাগাছ রোপণের জন্য কুড়ি টাকা পাইয়া থাকে। চেঞ্চুরা পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। কারনুল জেলায় শ্রীসাইলাম মূর্তি দর্শন করিবার জন্য যে সকল তীর্থযাত্রী আসে তাহাদের পথপ্রদর্শক ও বাহক হিসাবে কাজ করে এবং প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর নিকট ছয় পয়সা করিয়া আদায় করে। ইহার দ্বারা তাহারা বাজার থেকে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে। তাছাড়া তাহারা অন্যান্য সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়।

গৃহশিল্প—চেঞ্চুরা মদ তৈয়ারী করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটায় উপরন্তু স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। প্রধানতম স্থান চেঞ্চু অধ্যুষিত অঞ্চলে, মদ তৈয়ারীর জন্য কোন বাধানিষেধ ছিল না। পরে বাধানিষেধ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে চেঞ্চুদের মদ তৈয়ারীর মধ্যে বাধা আসে ফলে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের অনেকখানি অবনতি ঘটে। কিন্তু "মাদ্রাজ আবগারী আইন" অনুযায়ী তাহাদের মধ্য হইতে মদ তৈয়ারীর বাধানিষেধ তুলিয়া দেওয়া হয় ফলে তাহারা সম্পূর্ণ সময় মদ তৈয়ারী কাজে নিজদিগকে নিযুক্ত করে। আবার কোন কোন সমতলবাসী চেঞ্চুদিগকে মদ তৈয়ারীর জন্য মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করে। কোন কোন পরিবার সম্পূর্ণভাবে মদ তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—কৃষিকার্যের সহিত যুক্ত চাষের যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে খন্তা, জটীল খোদন যন্ত্র, দা, কুঠার, কাস্তে

ইত্যাদি। খন্তা (ডকুহুপাড়া)—চওড়া লোহার তৈয়ারী ফলা। ইহা লম্বা বাঁশের দণ্ডের মধ্যে পরান থাকে। ইহার দ্বারা মাটি তুলিয়া চারাগাছ রোপণের গর্ত করা হয়। জটীল খোদন যন্ত্র (কারুরাপাড়া) হইতেছে লম্বা শক্ত লোহার দণ্ড প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহা ২।৩ ফুট লম্বা বাঁশের দণ্ডের মধ্যে পরান থাকে। ইহার দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া মূল ও কাণ্ড সংগ্রহ করে। ইহা আত্মাকুরের কামারদের নিকট ক্রয় করে। দা (চেঞ্চু-কাঠ্ঠী) হইতেছে শক্ত লোহার তৈয়ারী চওড়া ধারাল ফলা এবং ইহা একটি ছোট হাতলের মধ্যে পরান থাকে। ইহা বাঁশ কাটার ও চেরাই করার জন্য ব্যবহার করে। ইহা বিশেষত চেঞ্চুরা ব্যবহার করে বলিয়া ইহাকে "চেঞ্চু কাঠ্ঠী" বলে। কুঠার (গোড্ডালি)—লোহার তৈয়ারী ধারাল কাটার অংশ এবং এক প্রান্ত আংটাতে পরিণত হইয়াছে। আংটার মধ্যে হাতল পরান থাকে। ইহার দ্বারা কাঠ এবং জঙ্গল কাটার কাজ করে। কাস্তে (কোডাভালি) হইতেছে চওড়া পাতলা লোহার তৈয়ারী, বাঁশের হাতলের মধ্যে পরান থাকে। ইহা ঘাস কাটা এবং ঘরের চালা তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহার করে। শিকারের জন্য প্রধান অস্ত্রশস্ত্র হইল তীর ও ধনুক এবং পাখী এবং ছোট ছোট প্রাণী শিকারের জন্য জাল ব্যবহার করে।

ধনুক ৪৪" হইতে ৫৫" লম্বা ২" হইতে ২½" ইঞ্চি চওড়া। বাঁশের চেরাই অংশ এবং ইহার গুণ হইতেছে ভেড়া বা হরিণের নাড়িভুঁড়ি হইতে তৈয়ারী। ইহারা তিন ধরনের তীর ব্যবহার করে। 'গোবাক' যাহার কার্যকরী অংশ লোহার তৈয়ারী শুঁচাল। ইহার দ্বারা ছোট পাখী, ইঁদুর, কাঠবিড়াল শিকার করে। 'বীলাম্বু' আর এক ধরনের তীর যাহার লোহার তৈয়ারী চওড়া ফলা এবং কার্যকরী অংশ শুঁচাল। এই ধরনের তীর খরগোস শিকারের জন্য ব্যবহার করে। তৃতীয় ধরনের তীর হইতেছে 'ওম্বু' চওড়া ফলা এবং দুই ধার ধারাল এবং কার্যকরী অংশ শুঁচাল। এই ধরনের তীর দ্বারা বড় বড় জন্তু বাঘ, পাইথন প্রভৃতি শিকার করে। তীরের ফলা, সরু বাঁশের দণ্ডের মধ্যে ঢুকান এবং প্রান্তে খাঁজ আছে ও খাঁজের উপরের অংশ পালক বাঁধা থাকে।

মধু সংগ্রহের জন্য মই-এর সাহায্যে গাছে চড়ে এবং মধুর চাক ভাঙিয়া মোচড় দিয়া মধু গালাই করে ও কাঠের পাত্র ও টিনের পাত্রে সংগ্রহ করে।

গৃহপালিত পশু—চেঞ্চুদের প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু হইতেছে ভেড়া, ছাগল এবং মুরগী ইত্যাদি। কোন কোন চেঞ্চু মহিষ প্রতিপালন করে কিন্তু বেশীর ভাগই ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালন করিয়া থাকে। যদি কাহারও নিজস্ব ভেড়া ছাগল না থাকে তাহা হইলে সমতল গ্রামবাসীদের নিকট হইতে শিশু অবস্থায় পশু লইয়া আসে এবং পালন করে। পরে বাচ্চা প্রসব করিলে বাচ্চার অর্ধেক পায় ইহাকে তাহারা 'পালু' বলে। এই ধরনের পালনের দ্বারা পশুর মূল্য অর্ধেক পাইয়া থাকে।

খাদ্য—চেঞ্চুরা জঙ্গলে বসবাস করে সেইজন্য জঙ্গলের খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহ করা তাহাদের নিকট অনিশ্চিত। সেইজন্য অনেক সময় খাদ্য জুটে অনেক সময় জুটে না। ইহারা ক্ষুধা মিটাইতে একমাত্র তিক্ত পাতা ছাড়া সকল পাতাই সিদ্ধ করিয়া লবণ সহকারে খায়। নানা ধরনের মূল ও কাণ্ড সিদ্ধ করিয়া খাইয়াও জীবন ধারণ করে। নানা ধরনের ফল, যেমন কোন্দাথাপানডলু ভিলাগা-পান্দলু, টিকা ফল ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য। ফুলের মধ্যে মহুয়া ফুল প্রধান। তেঁতুল খুব বেশী খাইয়া থাকে। ইহারা নানা ধরনের পশু পাখীর মাংস ভক্ষণ করে। কেবলমাত্র বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ ছাড়া সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে। মাংসকে সিদ্ধ করে না কেবলমাত্র আগুনে ঝল্‌সাইয়া খাইয়া থাকে। বর্তমানে সরকারী নীতি অনুযায়ী শিকারের মধ্যে বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় সকল প্রাণীর মাংস খাইতে পায় না। পূর্বে বানরের মাংস খুব প্রিয় খাদ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে ধর্মীয় চিন্তাধারার জন্য বানর মাংস খাওয়া প্রত্যাহার করিয়াছে। গিরগিটির মাংস ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

বর্তমানে ভাত ও যব খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণত দিনে দু-বার খাদ্য খায়। সকালের খাদ্যকে বলে 'উদয় ভোজনম" ইহা তৈয়ারী করে জোয়ার এবং লঙ্কা সংমিশ্রণে, কখনও কখনও লবণ সহ ভাত খায় এবং সন্ধ্যাবেলায় খাবার হইতেছে রুটি, জোয়ার হইতে তৈয়ারী করে। ইহার সহিত লবণ, লঙ্কা, তেঁতুল ও পিঁয়াজ খাইয়া থাকে। সকাল ও সন্ধ্যায় সকলে একত্রে মিলিয়া খাইতে বসে। ইহারা চা বা কফি খাইতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু প্রত্যেক চেঞ্চুই সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য খাওয়া ছাড়া থাকিতে পারে না। এমন কি প্রত্যেক চেঞ্চু স্ত্রী নিজের যৌন পিপাসা মিটাইবার জন্য

মাদকদ্রব্য সেবন করে। মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করিয়া খায় কিন্তু বর্তমানে "টুমা চিক্কা" হইতে মদ তৈয়ারী করে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—চেঞ্চুদের গ্রামগুলি পাহাড়ের গাত্রে জঙ্গলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ঘরগুলি নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনামূলক ভাবে তৈয়ারী নয়। ঘরগুলি ইতস্ততঃ ভাবে বিন্যস্ত। একটি ঘর হইতে অন্য ঘরের দূরত্ব ৫০ গজের মত। আত্মীয় বা জ্ঞাতি সম্বন্ধ লইয়া এক একটি গ্রাম তৈয়ারী। কোন কোন গ্রাম জঙ্গলের বাহিরে তৈয়ারী করে। চেঞ্চুরা গ্রামকে বলে 'গুডেম্'। এক একটি গ্রামে ৬।৭ টির বেশী পরিবার বাস করে না। ইহাদের বসতি নির্ভর করে সেখানকার পানীয় জলের উপর। বৃত্তাকার আসন বিশিষ্ট শঙ্কু আকৃতির ঘর হইল চিরাচরিত ঘরের ধরন। ঘরগুলি খুবই ছোট। ঘরের দেওয়াল ও চাল পৃথক করা যায় না। ঘর তৈয়ারীর জন্য প্রথমে একটি জায়গা পছন্দ করিয়া লয় তারপর কয়েক ফুট জায়গা গোলাকৃতি ভাবে চিহ্নিত করে এবং মাঝখানে একটি বড় কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া ফেলে ও খুঁটি হইতে ১০।১১ ফুট জায়গা ব্যাসার্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট বাঁশের খুঁটি বৃত্তাকারে মাটিতে পুঁতে। ইহার পর মাঝখানের খুঁটি হইতে ধারের খুঁটির মধ্যে বাঁশ দ্বারা আড়াআড়ি ভাবে সংযুক্ত করে। পরে বাঁশের পাতলা ছিলকা দ্বারা দেওয়াল তৈয়ারী করা হয়। দেওয়াল তৈয়ারী করার সময় প্রবেশ পথের জন্য একটি দরজা রাখে। ঘরগুলি বাঁশের কাঠামো করিয়া লতা পাতা কখনও বা খড় দ্বারা ছাউনি তৈয়ারী করে।

কোন কোন ঘরের দেওয়াল কেবল মাত্র বাঁশের দলমা দ্বারা তৈয়ারী। দরজাটি কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। জঙ্গলের ভিতরের গ্রাম ও বাহিরের গ্রামের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। বাহিরের গ্রামগুলির ঘর তৈয়ারী করে পাথরের দেওয়াল দ্বারা। কখনও কখনও তাহাদের চিরাচরিত ঘরের ধরন অপসারিত করিয়া বন বিভাগ বা কো-অপারেটিভ বিভাগ লম্বাকৃতি ঘর তৈয়ারী করিয়াছে। মান্নানুর, মহাবুবনগর জেলায় পঞ্চাশটি কামরাযুক্ত ঘর তৈয়ারী করিয়া পঞ্চাশটি চেঞ্চু পরিবারকে বিতরণ করিয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে তাহারা ঐ সকল ঘর পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা তাহাদের চিরাচরিত ধরনের ঘর তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মতে সরকার এই ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় তৈয়ারী করার ফলে বর্ষায় জল জমিয়া যায়।

ইহাদের চিরাচরিত ঘরের ভিতরগুলি কোন পরিকল্পনামূলক ভাবে সজ্জিত নয়। ঘরের ভিতরের অংশ প্রায় খালি থাকে কেবলমাত্র ঘরের ভিতরে কয়েকটি মাটির পাত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

কোন কোন ঘরের মাঝে একটি দেওয়াল দ্বারা দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। একটি কামরাতে গৃহপালিত পশু ও মদ তৈয়ারী করে অপরটিতে রান্না ও শয়নঘর। শয়নঘরের ভিতরের দিকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোন কোন সময় গোবর দিয়া পরিষ্কার করে। কিন্তু ভিতরের ছাদটি কালো অন্ধকার উনানের ধোঁয়াতে ঝুল হইয়া থাকে। উনানটি তিনটি পাথরের চাঙ দিয়া তৈয়ারী এবং মাটিটা একটু গর্তকরা। সাধারণত ঘরের উত্তরদিকে উনানটি অবস্থিত।

এই ধরনের ঘর তৈয়ারী করিতে খুব বেশী খরচ হয় না। জঙ্গল হইতে ঘর তৈয়ারীর সাজসরঞ্জাম যোগাড় হয় এবং ঘর তৈয়ারী করিতে একদিনের বেশী সময় লাগে না।

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র—গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বলিতে কয়েকটি মাটির পাত্র ও হাল্কা এ্যালুমিনিয়াম পাত্র ছাড়া আর কিছুই নাই।

ভাত রান্না করার জন্য মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করে যাহাকে বলে 'সারাভা' এবং তরকারী রান্না করার জন্য মাটির ছোট পাত্র ব্যবহার করে যাহাকে 'কুরা সারাভা', একটি বড় মাটির পাত্র যাহার দ্বারা খাবার জল সংগ্রহ করে তাহাকে বলে 'নীল্লা কাদাভা'। ইহা ছাড়া তাহারা এ্যালুমিনিয়মের থালা ও গ্লাস খাওয়া ও জল খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। খাদ্যশস্য জমা রাখে কোন মাটির পাত্রে অথবা বাঁশের ঝুড়িতে। অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে গৃহস্থালীতে শস্য ভানার জন্য কাঠের উদখল (Mortar and Pestle) যাহাকে বলে 'রলু ও রকালি'। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া বাঁশের খাটিয়া দেখা যায়।

পোশাক পরিচ্ছদ—চেঞ্চুদের পোশাক পরিচ্ছদ বলিতে কিছুই ছিল না। প্রাচীন কালে তাহারা বল্কল ও চামড়া পরিধান করিত। এখনও বয়ঃপ্রাপ্তদের কেবলমাত্র ছোট একখণ্ড কাপড়কে (যাহাকে 'গাচি বাটা' বলে) দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া সামনে ও পিছনে দড়ির মধ্যে আটকাইয়া রাখে। কেহ কেহ শীতকালে শরীরের উপরের অংশে কাপড় জড়াইয়া শীত নিবারণ করে। কিন্তু বর্তমানের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে চিরাচরিত পোশাকের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহারা সমতলবাসী ব্যবসায়ীদের

নিকট হইতে জামা প্যাণ্ট ক্রয় করিয়া পরিধান করে। মেয়েদের মধ্যে পোশাকের খুব বেশী একটা পরিবর্তন হয় না। তাহারা ছোট একখানা শাড়ী পরিধান করে। বর্তমানে চেঞ্চু ছেলেমেয়েদের সমতলবাসী ছেলে-মেয়েদের মত পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যালয়ে গমনকারী ছেলেরা প্যাণ্ট ও সার্ট পরিধান করে ও মেয়েরা স্কার্ট (প্যারিকিনি) ও জ্যাকেট পরিধান করে।

অলঙ্কার—মেয়েরা কোন অলঙ্কার পরিতে অভ্যস্ত নয়। কেবলমাত্র পিতলের তৈয়ারী কানের রিং পরিধান করে আবার কেহ হাতে আংটী পরিধান করে। মেয়েরা নানা রং-এর পুঁতির হার পরিধান করে। বর্তমানে রূপার তৈয়ারী 'কন্‌কিপুলা' অর্থাৎ কানের রিং এবং অধিকাংশ মেয়েরা অল্প দামী পিতলের অলঙ্কার ব্যবহার করে আবার পিতলের অলঙ্কারের মধ্যে সাদা পাথর বসান থাকে। মেয়েরা সাধারণত কাঁচের চুড়ি ব্যবহার করে। নাকে এ্যালুমিনিয়মের তৈয়ারী নোলক পরিধান করে। পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় পরিধান করা বিশেষ করিয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনের পরিচয় দেয়। কাঁচের চুড়ির ব্যবহার বিধবাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। চেঞ্চু স্ত্রীরা শরীরে উল্কি কাটিয়া সাজিতে ভীষণ পছন্দ করে। তাহারা কপালে ও উপরের বাহুতে উল্কি কাটিয়া দেহকে সাজাইয়া তুলে। যে উল্কি কাটার কাজ করে তাহাকে বলে "পাচ্চা বটোল্লু" (Pachcha Bottollu)। উল্কি কাটা শরীরকে সাজানর উদ্দেশ্যেই পছন্দ করে।

চুলের সৌন্দর্য—মেয়েরা চুলকে পিছনের দিকে আঁচড়াইয়া চুলকে একত্রিত করিয়া একটি গাঁট দেয়। ইহাকে 'কপু' বলে। চুলে তেল দেওয়া তাহাদের স্বভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে নারী কল্যাণ সমিতি হইতে নারিকেল তেল সরবরাহ করার ফলে মেয়েরা নারিকেল তেল মাখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষেরা সপ্তাহে দুবার মাথায় তেল দেয় এবং তাহারা কোন দিন চুল কাটিত না। কিন্তু বর্তমানে যুবসম্প্রদায় নিয়মিত মাথার চুল কাটিয়া নিজেদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। এমনকি তাহারা দাড়ি কাটার জন্য খুর ব্যবহার করে।

হস্তশিল্প—হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শী নয়। বাঁশ হইতে ঝুড়ি বুনিতে পারে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'থাপেটা' হইল প্রধান। ইহা গোলাকৃতি কাঠের

তৈয়ারী এবং ছাগলের চামড়া দ্বারা ছাওয়া থাকে। উৎসব অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে।

সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম :

অন্যান্য উপজাতির সহিত সম্পর্ক—চেঞ্চুদের সহিত তাহাদের প্রতিবেশী গোষ্ঠীদের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়।

যখন তাহারা কালাহস্তী অথবা পুটার সমতলভূমির দিকে যায় ক্রমশ ইয়ানিডিদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং তাহাদেরই একজনে পরিণত হয়। (১৯৪৮ : ১৪৮) থার্সটনের মতে "১৮৯১ সালের আদমসুমারী তথ্য অনুযায়ী চেঞ্চুরা ইয়ানিডিরই একটি শাখা। চেঞ্চু এবং ইয়ানিডি একই বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্তমানে চেঞ্চুরা বলে, তারা এবং ইয়ানিডি এক এবং একই, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়"। (১৯০৯ : ২৭) ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের এনকোয়ারী কমিটি যে মন্তব্য করে। "চেঞ্চু এবং ইয়ানিডি এক এবং একই। অতি সংক্ষেপে বলা যায় চেঞ্চু দৌড়াইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া যায় এবং ইয়ানিডিতে পরিণত হয়। তাহাদের খাদ্যগ্রহণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, গোত্র বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা প্রণালী সবই একই ধরনের।"

রাঘবাইয়া, (১৯৬২ : ১০৪, ১০৮ : ১১), একজন সমাজসেবী, একজন লোকহিতৈষী (Philanthropist) তিনি বহুদিন যাবৎ ইয়ানিডিদের কল্যাণমূলক কাজ করেন এবং দেখিতে পান ইয়ানিডি এবং চেঞ্চু একই। এই মন্তব্যের জন্য একত্রিশটি তত্ত্বের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য, ঘরের ধরন, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্তমান ঔষধপত্রের বিদ্বেষভাবাপন্ন, ভ্রাম্যমান জীবনযাপন, খাদ্যান্বেষণ, অর্থনৈতিক জীবন, কৃষিজীবনে বিদ্বেষ, বহির্বিবাহমূলক গোত্র, সর্বাত্মবাদের অভাব প্রভৃতি।

সুতরাং উপরের মন্তব্যগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় চেঞ্চু এবং ইয়ানিডি এক গোষ্ঠীর মানুষ। কোন এক সময় পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। দৈহিক গঠন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মিল থাকায় ইহারা একই বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধরা হয়।

শাখা শ্রেণী—অন্ধ্র প্রদেশের চেঞ্চুদের সমগ্রভাবে চারিটি শাখায় ভাগ করা যায়। যেমন (১) **কয়া চেঞ্চু** যাহারা খামাম জেলার ভদ্রাচলম অঞ্চলে বাস করে। (২) **কন্‌ডা চেঞ্চু** যাহাদের দেখা যায় কারনুল এবং মহাবুবনগর জেলার নাল্লামাল্লাই অঞ্চলে (৩) **দশেরী চেঞ্চু** কারনুল জেলায় বাস করে (৪) **উড়া চেঞ্চু** যাহারা শহরে এবং গ্রামে বাস করে।

বর্তমানের মহাবুবনগর এবং কারনুল জেলায় কন্‌ডা চেঞ্চু এবং গানটুর জেলায় উড়া চেঞ্চুদের মধ্যে দেখা যায়; উড়া চেঞ্চুরা, কন্‌ডা চেঞ্চু বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্তমানে পাহাড় ছাড়িয়া সমতলভূমির গ্রামে বাস করিতেছে। উড়া চেঞ্চু এবং কন্‌ডা চেঞ্চুদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কয়া চেঞ্চু শব্দটি ভদ্র-চলমের কোনিয়া চেঞ্চুর সমান। কন্‌ডা চেঞ্চু এবং কয়া চেঞ্চুদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক এবং খাওয়ার আদান প্রদান হয় না। কন্‌ডা চেঞ্চুরা কয়া চেঞ্চুদের তুলনায় উন্নত স্তরের বলিয়া মনে করে। চেঞ্চু দশেরী সম্বন্ধে চেঞ্চুদের মধ্যে নানা দ্বিধা আছে। কারনুল এবং গুন্টুর জেলার চেঞ্চুরা দাবী করে দশেরী চেঞ্চুরা, চেঞ্চুদের একটি আলাদা শাখা যাহাদের জীবিকা ভিক্ষা করা। তাহাদের সহিত অন্যান্য চেঞ্চুদের সহিত সম্পর্ক কম।

গোত্র—চেঞ্চুরা নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করে। সমস্ত উপজাতি বহির্বিবাহমূলক গোত্রে বিভক্ত। বর্তমানে হিন্দুদের মত গোত্র শব্দই ব্যবহার করে। 'খামাম, মহাবুবনগর এবং কারনুল জেলায় চেঞ্চু-দের মধ্যে ২৬টি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে (১) মারেপাল্লী (২) মাদলা (৩) থোকালা (৪) নীম্মালা (৫) চিগুরলা (৬) নাল্লাপথুলা (৭) ইরাভালা (৮) পলিচেরলা (৯) উদুটালুরী (১০) দশারী (১১) মাইলু (১২) কোত্রাজু (১৩) বলমুরী (১৪) কান্নীমুন্নী (১৫) ভূমানী (১৬) কুদুমুলা (১৭) গোরাবইয়ানা (১৮) গুলা (১৯) তোপী (২০) আর্থী (২১) বোজা (২২) মমীদী (২৩) গাদমল্লু (২৪) পিট্টলু (২৫) জোল্লা (২৬) চাভাডি। এই সকল গোত্রগুলি একই জেলায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জেলায় গোত্রগুলি দেখা যায়। চেঞ্চুদের মধ্যে ভ্রাতৃদল (Phratry) লইয়া ভ্রান্তধারণা রহিয়াছে। হাইমেনডরফ্ মনে করেন যে; সমস্ত গোত্রগুলি চারিটি বহির্বিবাহমূলক বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই বিভাজনের নাম উল্লেখ করেন না।

চেঞ্চুদের গোত্র গাছপালা, জীবজন্তুর নামানুসারে হইয়া থাকে। গোত্রের নামানুসারে জীবজন্ত ও গাছপালার নামও দেখা যায়; তাহারা হইতেছে :—

গোত্রের নাম	গোত্রদেবতার নাম
আর্থী	কলাগাছ
নীম্মালা	কুনা গাছ
কুত্রমুলা	কুত্রমু (এক ধরনের মিষ্টি)
উত্রুতলা	কাঠ বিড়াল
টোকালা	লেজ
নাল্লাপোথুলা	কাল ছাগল
বজ্জা	পাকস্থলী

বর্তমানে নীম্মালা গোত্র বিশিষ্ট চেঞ্চুরা তাহাদের ইরাভালু উপ-গোত্র আছে বলিয়া বলে। কিন্তু ইহার সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইরাভালু উপ-গোত্রের লোকেরা কেবল মাত্র পলিচেরলাতে বসবাস করে না, তাহারা অমরাবাদ উপত্যকায় বসবাস করে।

পরিবার—চেঞ্চুদের ছোট সংস্থা হইতেছে পরিবার। গোত্রগুলি পরিবারে বিভক্ত এবং গোত্রের তুলনায় পরিবারগুলি শক্তিশালী। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই প্রাথমিক পরিবার দেখা যায় অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের লইয়া ইহাদের প্রাথমিক পরিবার। সাধারণতঃ বিবাহের পর স্ত্রী পুত্র লইয়া পিতার পরিবার হইতে আলাদাভাবে সংসার গড়িয়া তুলে। ইহাদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী, স্বামীর বাড়িতে আসিয়া বসবাস করে কিন্তু সময় সময় স্বামীও স্ত্রীর গ্রামে বসবাস করিতে যায়। ইহাদের মধ্যে যৌথ পরিবার অর্থাৎ কয়েক ভাই তাহাদের পুত্র কন্যাদের লইয়া একত্রে বসবাস, একেবারেই দেখা যায় না। স্ত্রীরা স্বামীর গোত্র পাইয়া থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নাম পরিচিতি সকলই পুরুষদের দিকে চালিত হয়।

আত্মীয়তা সম্বন্ধ—চেঞ্চুদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্বন্ধ হইতেছে শ্রেণীগত (Classificatory) এবং দ্বিপার্শ্বিক। পিতা এবং মাতা উভয় দিকেই

আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার কার্যকারিতা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায় বিশেষ করিয়া জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি অনুষ্ঠানে।

কখনও কখনও বৈবাহিক কুটুম্ব যেমন বোনের স্বামী, নানারকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

জীবন চক্রে—কারনুল, মহাবুবনগর এবং গুন্টুর প্রভৃতি অঞ্চলের চেঞ্চুদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রায় একই ধরনের, যদিও ইহাদের অর্থনৈতিক জীবন ও বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ থাকে, কারণ অন্যান্য সমতলভূমির মানুষদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। প্রায় সমগ্র অঞ্চলের চেঞ্চুরা তাহাদের প্রাচীন চিরাচরিত সংস্কৃতি পালন করে।

জন্ম—চেঞ্চুরা মনে করে সন্তানের জন্ম হওয়া দেবতার দান। পুত্র অথবা কন্যার জন্ম হওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিমত নাই উভয়েরই জন্ম তাহারা সানন্দে গ্রহণ করে। চেঞ্চুরা মনে করে স্ত্রীদের মাসিক বন্ধ হওয়ার কারণই হইতেছে সন্তানের জন্ম হওয়া। ইহার জন্য কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। যদি কন্যার পিতামাতা জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহারা অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং সন্তানের জন্ম হওয়ার পর পর্যন্ত কিছুদিন রক্ষণাবেক্ষণ করে। পিতামাতার বাড়ীতে প্রসব হয় অথবা স্বামীর বাড়ীতে প্রসব হয়। চেঞ্চুরা বিশ্বাস করে যদি ছেলের জন্ম হয় তাহা হইলে গর্ভধারণের সময় লাগে নয় মাস এবং যদি মেয়ের জন্ম হয় তাহা হইলে গর্ভধারণের সময় লাগে দশ মাস। তাহারা মনে করে পুরুষ সন্তানের জন্ম তাড়াতাড়ি হয় কারণ তাহাদিগকে বাহিরের কাজ ও তাড়াতাড়ি উপার্জন করিতে হইবে। স্ত্রী সন্তান মাতৃগর্ভে বেশী দিন স্থায়ী হয় কারণ ইহারা দুর্বল। সেইজন্য ভগবান ইহাদের বেশী সময় মাতৃ গর্ভে রাখে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খাদ্য গ্রহণে সে রকম কোন নির্দিষ্ট বাধানিষেধ (Taboo) নাই তথাপি তাহারা মনে করে বন্য শূকরের মাংস ভক্ষণ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকারক। তাহারা আরও মনে করে যদি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নিয়মিত কাজের জন্য বাহির হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রসব করা অতি সহজতর হয়। যতক্ষণ না প্রসব ব্যথা অনুভব করে ততক্ষণ তাহারা সেই অবস্থায় কাজে বাহির হয়। প্রসব হওয়ার জন্য সাধারণভাবে বসা অবস্থায় প্রসব করে। অনেক সময় দেহের ভার রক্ষার জন্য উপর হইতে ঝুলন্ত দড়িকে ধরিয়া

থাকে। যখন প্রসব ব্যথা অনুভব করে তখন একজন তাহাদের মধ্য হইতে বৃদ্ধা মহিলাকে ধাত্রীমাতার কাজে নিযুক্ত করে। ধাত্রীমাতা ছুরিকা দ্বারা নাভি ছেদন করে এবং ইহা মাটিতে গর্ত করিয়া পুঁতিয়া দেয়। অনেক সময় ঘরের চালে দড়িতে বাঁধিয়া রাখে। হাইমেনডরফ্‌-এর মতে নাভি ছেদন করিয়া দড়িতে বাঁধিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখে এবং সেই স্থানেই সদ্যজাত শিশুকে স্নান করান হয় (১৯৪৩ : ১৪১)। শিশু প্রসব হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাকে কিছু মাদক দ্রব্য পান করায়। দ্বিতীয় দিনে সকালবেলা মুখ ধৌত করার আগে পাতার রস (decoction) তৈয়ারী করে এবং মাদকদ্রব্য হিসাবে সেবন করিতে দেয়। ইহা ভেপাচাক্কা, নেলাভেমু পাতা, আদা, লঙ্কা প্রভৃতির সংমিশ্রণে তৈয়ারী। পাঁচ থেকে আট দিন পরে প্রধান খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। জন্মের জন্য কোন অশৌচ পালন করে না। ধাত্রীমাতা তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে ২টাকা পায় পুত্র সন্তানের জন্য এবং কন্যা সন্তানের জন্য ১'৫০ টাকা পাইয়া থাকে।

মহাবুবনগরের চেঞ্চুদের মধ্যে দেখা যায় যাহাতে তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব হয় সেইজন্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা আছে এবং স্বামী পূজা করে। যদি প্রসব হইতে দেরী হয় তাহা হইলে স্বামী বুঝিতে পারে কোন দুষ্ট অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা ঘটিতেছে তখন ওঝা দ্বারা নানা ইন্দ্রজালিক কলা-কৌশলে ইহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। যদি ইন্দ্রজাল কার্যকরী না হয় তাহা হইলে "গরেলামায়সাম্মা" দেবতার উদ্দেশ্যে এক সের যব উৎসর্গ করে।

শিশুদের চার বৎসর পর্যন্ত মাতৃস্তন পান করান হয়। জন্ম গ্রহণের এক বৎসর পর হইতেই নানা জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত করিয়া তুলে।

নামকরণ উৎসব—কখনও কখনও তাহারা শিশুদের জন্মের পূর্বেই নামকরণ করিয়া থাকে। যখন পিতামাতার কোন সন্তান না বাঁচে তখন কোন দেবতার নামে অথবা সন্ন্যাসীর নামে নামকরণ করিয়া থাকে। সর্বক্ষেত্রেই পাঁচ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত শিশুর নামকরণ করে না। কিন্তু কারনুল জেলায় শিশুদের নামকরণ চতুর্থ দিনেই করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ছেলেদের ক্ষেত্রে নাম দেয় মুজেম্মা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মুজেম্মা। পুরুষ চেঞ্চুর নামের শেষে আন্নু বা লু বা আই বা আয়া থাকে যেমন লিংগান্নু, রাজুগান্নু, পালানজু, চিন্নাআয়া এবং মেয়েদের নামের শেষে আম্মা থাকে

যেমন গুরুভাম্মা, মজেম্মা ইত্যাদি। প্রায় সমস্ত নামই কোন দেবতার নামে দিয়া থাকে যেমন লিংগাড়ু নাম দেওয়া হইয়া থাকে লিংগমাই দেবতার নামানুসারে।

মাথামুণ্ডন উৎসব—শিশু যখন ৩।৪ বৎসরের হইয়া থাকে তখন তাহার পিতামাতা একটি উৎসব পালন করিয়া থাকে। শিশুকে যে কোন দেবতা যেমন লিংগমাই, গুরুভাই, বাইয়ানান প্রভৃতি স্থানে লইয়া আসে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এক গোছা চুল ছাড়া সব চুলই কাটিয়া ফেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে কয়েক গোছা কাটিয়া ফেলে। ইহার পর মামাকে, একটি টুপি এবং নূতন কাপড় দেয় কাঁধে জড়ানর জন্য। ইহার পরিবর্তে মামা তার বোনকে একটি শাড়ী এবং ভাগ্না ভাগ্নীকে একটি নূতন কাপড় দেয়।

সাধারণতঃ ১৪ বৎসর বয়সে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথম মাসিক আরম্ভ হয়। ইহাকে তাহারা "পচুচু সমরথাইনদীর ইডিজনাডি" বলে। মাসিকের সময় বালিকাকে ঘরের এক কোণে রাখে। সেই সময় ঘরের ভিতরটি গোবর দ্বারা পরিষ্কার করে। তাহাকে দেওয়া হয় একটি হলুদ গুঁড়া মাখান এবং চুনের ফোঁটা দেওয়া তীর। এই সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা তাহাকে কাপড় পরিতে সাহায্য করে। কাপড়টি হলুদ মাখান থাকে ও তাহার দেহে হলুদ গুঁড়া মাখাইয়া দেয়। এই কয়েকদিন তাহার বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার সময় বালিকা তাহার অলঙ্কার পরিধান করে এবং সমস্ত মেয়েরা একত্রিত হয় এবং নাচ ও গান আরম্ভ করে।

"চিট্টি এলুকালানি চীরেলু কাট্ট কা
পেগুলী ভাদলু দানচাঙ্গা,
জাম্মি আকুলা বিস্থারালু কুট্টী
ভাক্সা তজানামু বিধ্যাঙ্গা"

ইহার অর্থ "সমস্ত ছোট ইঁদুররা শাড়ী পরিধান করিয়াছে, বিবাহে সরবরাহের জন্য ধান কুটিয়া চাল তৈয়ারী করিতেছে। স্বামী পাতার থালা তৈয়ারী করিতেছে তাহাতে খাদ্য ও মিষ্টিদ্রব্য সরবরাহের জন্য।"

বিবাহ—চেঞ্চুদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে আসিয়া বসবাস করে। চেঞ্চুদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই ধরনের বিবাহ

দেখা যায়। যেমন প্রজাপত্য বিবাহ ইহাকে চেঞ্চুরা বলে 'পেল্লী' এবং গান্ধর্ব্য বিবাহ যাহাকে বলে 'রাজী'। ইহাদের মধ্যে একই গোত্রে বিবাহ হয় না। আত্মীয় বিবাহ ইহাদের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত আছে। একই গ্রামে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করা ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় নিষেধ। যুবকরা নিজ গ্রামে বিবাহ করিতে চায় না তাহারা ভিন্ন গ্রামে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পছন্দ করে। ছোট বা বড় ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ।

যখন কোন ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাহার পিতামাতা পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খোঁজ করে। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেলে কয়েকজন আত্মীয়স্বজন মিলিয়া পাত্রীর বাড়ীর সহিত যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের জন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। যদি যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয় তাহা হইলে পাত্রের পিতা কন্যার পিতাকে এবং যে সমস্ত আত্মীয়রা উপস্থিত থাকে তাহাদিগকে মদ খাইতে দেয়। কোন কোন অবস্থায় যখন কোন চেঞ্চু মদ পান করিতে আসক্ত হয়, কিন্তু কোন সুযোগ পায় না তখন সে তাহার কন্যাকে মদের পরিবর্তে অগ্রিম দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। কোন মদের দোকানের মালিককে অথবা যে ব্যক্তি মদ ক্রয় করার জন্য টাকা দেয়। যদি পিতা সর্তভঙ্গ করিয়া কন্যাকে সর্তের বিরুদ্ধে অন্য কোন লোককে অর্পণ করে তাহা হইলে তাহাকে 'থাপ্পু' বা বিরোধিতা বলে এবং তাহাকে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

সাধারণতঃ বিবাহে ছেলের মতামতই চূড়ান্ত মতামত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সেইজন্য ছেলে নিজে তাহার পিতামাতাকে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

বিবাহ অনুষ্ঠান—পাত্র ও পাত্রীর পরিবারের দিক থেকে যদি যোগাযোগ ও মতামত স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে যে কোন রবিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন স্থির করা হয়। কন্যার বাড়ীতে বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বরপক্ষ তাহার আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া বিবাহের দিন সন্ধ্যায় কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই বরপক্ষ কন্যাকে যৌতুক হিসাবে নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়, গহনা উপহার দেয়। নগদ ৬·২৫ টাকা দিতে হয় এবং গহনা নির্ভর করে বরের আর্থিক

অবস্থার উপর। যে কিছুই দিতে পারে না, সে কেবল মাত্র একটি 'তালিবট্টু' অর্থাৎ বিবাহ পদক উপহার দেয়। এরপর বরপক্ষকে ভোজ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কন্যা বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য তৈয়ারী হইতে থাকে। ইহাকে তাহারা "পেল্লীকুথুরু চিউটা" বলে। তাহাকে স্নান করানোর পর নূতন কাপড়, গহনা পরিধান করিতে দেওয়া হয়। সেই রকম বরও বিবাহের জন্য নিজেকে তৈয়ারী করে ও সার্ট, গোচি (কাপড়), টুপি পরিধান করে। তারপর বর এবং কনে উভয়েই বিবাহ স্থানে বসে এবং সেই সময় সকল আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থাকে। এখন 'কোলাগাল্লুশ' অর্থাৎ কুলবৃদ্ধ (Clan elder) কনের হাত লইয়া তাহার মামার হাতে তুলিয়া দেয়, মামা তখন কন্যার হাত লইয়া বরের হাতের উপর প্রদান করে ও মামা বরের কাঁধের উড়ুনির সহিত কনের শাড়ীর আঁচল বাঁধিয়া দেয়। তারপর কোলাগাল্লু একটি পানকে ভাঁজ করিয়া তাহার মধ্যে একটি সুপারি দিয়া চিবাইতে দেয়। এবং সকলকেই জিজ্ঞাসা করে "কেহ সুপারী ভাঙ্গার শব্দ পাইয়াছ?" সকলেই না, না এইভাবে আনন্দ উচ্ছ্বাস করিতে থাকে। তারপর বর এবং কনেকে সকলে উপহার দেয়। এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নাচ ও গান আরম্ভ হয়। বর এবং কনে উভয়েই মদ্য পান করে এবং মাদল বাজার সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গান আরম্ভ করে। এই ভাবে সকলে মিলিয়া সারা রাত্রি আনন্দ উপভোগ করে। পরের দিন সকালে বর ও কনে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলে মিলিয়া বরের বাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

গান্ধর্ব বিবাহ—গান্ধর্ব বিবাহ ইহাদের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে। যখন কোন যুবক যুবতী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাদের পিতামাতা ইহাতে বাধা দেয় ফলে তাহারা জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া যায়। পরে যদি তাহাদের পিতামাতা রাজী হয় তাহা হইলে ফিরিয়া আসে অথবা তাহাদের অন্য গ্রামের মানুষ যদি সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করে তাহা হইলে বিবাহিত দম্পতি হিসাবে সেখানে বসবাস করে।

বিধবা বিবাহ চেঞ্চুদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত।

বিবাহ বিচ্ছেদ—পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে অতি সহজভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। যদি কোন স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সহিত যৌন সঙ্গম করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার স্বামী প্রথমে গ্রামের মাতব্বরদের জানায়

এবং বিচ্ছেদের কথা বলে। উভয়ের মধ্যে যদি সম্বন্ধ ভাল না হয় তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর অন্য লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় স্ত্রীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করে। এই সভাকে তাহারা "কুলপঞ্চায়েত" বলে। ক্ষুব্ধ স্বামী সভাতে জানায় এবং তাহাদের মদ ও খাদ্য খাইতে দেয়। তারপর মাতব্বররা নূতন স্বামীর নিকট সে দিনকার খরচ ও জরিমানা আদায় করে এবং স্ত্রীকে সমস্ত গহনা ও সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হয়। ছেলে ও মেয়েরা যদি অল্প বয়স্ক হয় তাহা হইলে যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ততদিন মার কাছে থাকে, পরে পিতার নিকট ফিরিয়া আসে।

বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ক—অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাধ যৌন সঙ্গম চেঞ্চুদের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া মহুয়া ফুলের ঋতুতে। অর্থাৎ এই সময় মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করিয়া পান করিতে বিশেষ আসক্ত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ পান করিয়া থাকে এবং অবাধভাবে মেলামেশা চলে।

মৃত্যু:—যে কোন কারণেই কাহারও যখন মৃত্যু ঘটিবে তাহাকে তাহারা দেবতার বা মৃত আত্মীয়ের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই ক্রিয়াকলাপকে দূরীভূত করার জন্য কোন অনুষ্ঠান করে না। যখনই কেহ মারা যায় তখনই চেঞ্চুরা বলে 'জীভম্' (আত্মা) দেহ হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা আরও বলে 'জীভম্', স্বামী বা ভগবানের নিকট চলিয়া গিয়াছে। চেঞ্চুরা মৃতদেহকে দাহ করে অথবা কবর দিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্র, ভাই অথবা মামা শরীরকে ধৌত করিয়া পায়ের পাতাতে হলুদ মাখাইয়া দেয় এবং পাগুলিতে ছাই মাখাইয়া দেয়। চুলগুলি ধৌত করিয়া অথবা তেল মাখাইয়া দেয়। শেষে মৃতদেহকে তাহারই কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেয় এবং চার অথবা আটআনা পয়সা বাঁধিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে তাহার কাঁচের চুড়ি বাদে বাকী অলঙ্কার খুলিয়া লয়। মৃতদেহকে শ্মশান বা কবর স্থানে লইয়া যায় না যতক্ষণ না যে গোত্রের লোক মারা যায় সেই গোত্রের সেই গ্রামের প্রত্যেক পরিবার হইতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য আসে। ঐ গোত্রের যদি কোন লোক সৎকারে অংশ গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহাকে 'থাপ্পু' বা অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাহার একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। যদি কোন

বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার পিতামাতা তাহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না কারণ তাহাকে অন্য লোকের নিকট স্ত্রী হিসাবে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম-গোত্রীয় গ্রামবাসীদের নিকট খবর পাঠান হয়।

প্রত্যেক গোত্রের পৃথকভাবে কবরস্থান অথবা শ্মশানভূমি থাকে। যে সকল পরিবার দশারী চিগুরলা, কুড়মুলা, গুলা এবং মাদ্‌লা গোত্র হইতে আসিয়াছে তাহাদের দাহ করার প্রথা আছে। আবার হাইমেনডরফ্ লক্ষ্য করিয়াছেন চেঞ্চুদের মধ্যে দাহ করার প্রথা বর্তমানে প্রচলিত হইয়াছে সমতলভূমির অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসার ফলে। যখন মৃতদেহকে শ্মশানে বা কবরস্থানে লইয়া যায় তখন সকলে মিলিয়া মহুয়ার মদ পান করে এবং আত্মীয়স্বজন মিলিয়া মৃতদেহকে বহন করে ও যাওয়ার পথে একটি স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও কিছু জোয়ার মৃতদেহের সঙ্গে দেয়। যদি শিশুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ কাঁধে করিয়া বহন করে কিন্তু বয়স্ক বা বৃদ্ধ লোক হইলে খাটিয়ার (bier) দ্বারা বহন করিয়া থাকে। কোন বাদ্যযন্ত্র এই শোকযাত্রাতে ব্যবহার করা হয় না।

শ্মশান বা কবরস্থানে পৌঁছানর পর যে গোত্রের লোক মারা গিয়াছে কেবল মাত্র সেই গোত্রের লোকেরা চিতা তৈয়ারী করার কাঠ সাজাইতে অথবা কবরের জন্য গর্ত করিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যদি কবর দেওয়া হয় তাহা হইলে মৃতদেহকে একটি কাপড় দ্বারা জড়াইয়া গর্তের মধ্যে রাখে এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী অথবা স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী অথবা অন্য যে কোন রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যক্তি বা নারী প্রথমে দুই মুঠা মাটি কবরে দিয়া আরম্ভ করে পরে সকলে মিলিয়া মাটি ভরাট করিয়া দেয় কিন্তু যদি দাহ করা হয় তাহা হইলে মৃতদেহকে চিতার উপর তোলা হয় এবং নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তি বা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া চিতায় তোলে এবং মৃতদেহের মুখ উপরের দিকে রাখে। দাহ বা কবর শেষ করিয়া সকলে ফিরিয়া আসে। কেবল মাত্র যাহারা মৃতদেহ বহন করে তাহারাই স্নান করে অপর সকলে হাত ও পা ধৌত করিয়া লয় এবং পুনরায় মদ পান করে।

অশৌচ তিন দিন ধরিয়া চলিতে থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পনেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাকে তাহারা "পেড্ডাদিবসম্" বলে। এই সময় সেই পরিবারের কোন সভ্যকে কেহ স্পর্শ করে না। যদি বিবাহিত কেহ

মারা যায় তাহা হইলে তৃতীয় দিনে তাহার চিতাভস্ম অথবা পরিত্যক্ত অংশ পুনরায় কবর দেয়। তাহার পর দ্বিতীয় কবরস্থানে কিছু পাথরের টুকরা একত্রিত করিয়া রাখে এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য মৃতের নামে উৎসর্গ করে। ইহাকে তাহারা 'চিন্নাদিবসম্' বলে। পনেরো দিন পরে যখন 'পেড্ডাদিবসম্' পালিত হয় তখন ঐ দিন আমিষ জাতীয় খাদ্য মৃত ব্যক্তির নামে ঝর্ণার জলে অথবা পুকুরে উৎসর্গ করে ও সকলে মিলিয়া মদ পান করে। যদি স্বামী মারা যায় তাহা হইলে স্ত্রী অর্থাৎ বিধবা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলে এবং পুনরায় শাঙা বিবাহ করিতে পারে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার—চেঞ্চুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক সম্পত্তি উভয়ই থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে বুঝায় তীর ধনুক এবং অন্যান্য শিকারের যন্ত্রপাতি। পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে গৃহপালিত পশু, ঘরবাড়ী এবং বাসনকোসন ও আসবাবপত্র।

চেঞ্চুদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ। সেইজন্য সমস্ত সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী পুত্রেরা হইয়া থাকে এবং সকল পুত্র সমানভাবে অংশ পাইয়া থাকে। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক সময় সম্পত্তির বেশী অংশ পাইয়া থাকে। যদি স্ত্রী মারা যায় তাহা হইলে যে সমস্ত অলঙ্কার পিতামাতার নিকট পাইয়াছিল সমস্তই কন্যার মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। যদি কন্যা না থাকে তাহা হইলে পুত্ররাই পাইয়া থাকে। গবাদি পশু থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি বেশী গরু পাইয়া থাকে। কন্যারা দুটি একটি ছাগল বা ভেড়া পাইয়া থাকে। যদি অপুত্রক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মারা যায় তাহা হইলে স্বামীর রক্ত সম্বন্ধীয় কাহারও নিকট সম্পত্তি স্থানান্তরিত হইয়া থাকে।

গ্রাম সংগঠন—চেঞ্চুদের গ্রাম সংগঠন একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপর গ্রাম সংগঠন নির্ভর করে। ইহাদের গ্রাম সংগঠনের নাম 'কুলপঞ্চায়েত'। চিরাচরিত পঞ্চায়েত কাঠামো কয়েকজন মাতব্বর দ্বারা গঠিত হয়। ইহারা প্রত্যেক গোত্র হইতে আসে। ইহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে বলে 'রাজু' অর্থাৎ রাজা, তিনি 'ভীমানী' গোত্র হইতে আসেন। প্রধানের সহকারীকে বলে 'প্রধানী' অর্থাৎ মন্ত্রী। তিনি 'কুতুমু্‌ন' গোত্র হইতে

আসেন। 'কোলাগাল্লু' অর্থাৎ বার্তাবাহক সাধারণতঃ দুইজন থাকেন এবং তাঁহারা উদাতলা এবং মাদ্লা গোত্র হইতে আসেন। কোলাগাল্লু দুইজন রাজু এবং প্রধানীকে পঞ্চায়েত কাজের সহযোগিতা করেন। রাজু, প্রধানী এবং কোলাগাল্লু তাঁহাদের নিজ নিজ একই বংশ হইতে আসেন। পঞ্চায়েতের কার্য গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বর্তমানে পঞ্চায়েতের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনেকটা একনায়কতন্ত্র বলবৎ হইতেছে। প্রত্যেক চেঞ্চু গ্রামে একজন প্রধান নিযুক্ত হন তাঁহাকে বলে 'পেড্ডামাঞ্চি'। যাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। চেঞ্চুরা তাঁহার সমস্ত রকম আদেশ ও উপদেশ পালন করিয়া থাকে। তাহারা প্রধানকে এমনভাবে নির্বাচিত করিয়া থাকে যাহার জ্ঞান এবং সকলপ্রকার সমস্যা সমাধান করার অভিজ্ঞতা থাকে। কখনও কখনও পাঁচ ছয়জন বয়স্ক সহকারী থাকেন। বেয়ারলুটি ও নাগালুটি গ্রামে দুই রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। বর্তমানে বন শাসন বিভাগ কর্তৃক দুইজন করিয়া প্রধান নিযুক্ত হন। যাঁহারা গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করেন। তখন তাহাদের বংশানুগত পঞ্চায়েতের কার্যকারিতা অনেকটা খর্ব হয়। অনেক সময় বন বিভাগ দুইজন শিক্ষিত চেঞ্চু যুবককে প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করিতেছে কারণ বংশানুক্রমিক নেতারা বন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত নেতাদের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। চেঞ্চুদের মধ্যে আঞ্চলিক নেতা বলিয়া কেহ থাকে না।

ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব— চেঞ্চুরা নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। নিজেদের পূর্বপুরুষের দেবতা ছাড়াও অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করে। বহু দিন যাবৎ হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দু দেব-দেবীর পূজাতে আকৃষ্ট হইতেছে এবং নিজস্ব ধর্ম হারাইতে বসিয়াছে।

চেঞ্চুদের প্রধান দেবতার নাম "লিঙ্গ মাইয়া" (ভগবান ঈশ্বর)। শ্রাবণ মাস অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে প্রত্যেক পরিবার মাঠে একটি করিয়া ছোট পাথর দাঁড় করাইয়া মুরগী, ছাগল উৎসর্গ করে। "বেয়াম্মা" হইতেছে শিকারের দেবতা। শিকারে বাহির হওয়ার সময় তাঁহার পূজা দেওয়া হয়। বেয়াম্মা দেবতা একজন তীরন্দাজ। ইহা চেঞ্চুদের মধ্যে বিশ্বাস 'বেয়াম্মা' একজন চেঞ্চু ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী ছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে তীর ধনুক উপহার দেন

এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন যে তাঁর তীর কোন দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। সেইজন্য 'বেয়াম্মা' দেবতার আশীর্বাদে তাহারা সকলেই একজন তীরন্দাজ। চেঞ্চুরা একটি পাথরকে প্রতিকৃতি করিয়া পূজা দেয়। শিকারে বাহির হওয়ার সময় ঐ প্রতিমূর্তিতে নারিকেল অথবা মুরগী উৎসর্গ করে।

চেঞ্চুদের নানা দেবীও আছেন। মায়সাম্মা, সুনকালাম্মা, পেদাম্মা, মগুলাম্মা এবং আমাথালী হইল প্রধান। পেদাম্মা, মায়সাম্মা, আমাথালী হইতেছেন সংক্রামক ব্যাধি কলেরা, বসন্ত, পাণিবসন্ত প্রভৃতির দেবতা। তাঁহাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বৎসরে একবার মার্চ মাসে পূজা দেয় এবং ছাগল ও মুরগী উৎসর্গ করে। মায়সাম্মা দেবতা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং শত্রুকে নিধন করে। তাহারা মায়সাম্মা দেবতাকে অনেক সময় আগুনে নিক্ষেপ করে যখন তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হয়। ফলে দেবতা ভীত হইয়া বন্য শূকর, বাঘ, সাপ প্রভৃতিদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। গরলা মায়সাম্মা একই ধরনের দেবতা যিনি বন্য জীবজন্তু হইতে চেঞ্চুদের রক্ষা করেন। 'ভগভাতরু' অপর একজন দেবতা যিনি আকাশে বিচরণ করেন এবং চেঞ্চুরা বিশ্বাস করে প্রত্যেকের মধ্যেই 'জীভ' (প্রাণ) আছে এবং মৃত্যুর পর 'ভগভাতরুর নিকট ফিরিয়া আসে, আবার যে মানুষ দুষ্ট কর্মে লিপ্ত ছিল তাহার 'জীভ'কে 'দীয়াম' অর্থাৎ দুষ্ট ভূতে পরিণত করে।

যে সকল চেঞ্চুরা সমতল ভূমিতে বাস করে তাহারা হিন্দুদের মত ভগবান শিব, রাম, হনুমানের পূজা করে। তাহারা হিন্দু মন্দির দর্শন করে। আবার মুসলমান পীর বা 'দারগাও'কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। দারগাও শব্দের অর্থ 'গম্বুজ'। চেঞ্চুদের বিশ্বাস তিনি চেঞ্চুদিগকে সহানুভূতির সহিত দেখিতেন। মহাবুবনগর এবং গুন্টুর জেলায় চেঞ্চুদের মধ্যে যিনি পূজা করেন তিনিই জীবজন্তুর শিরশ্ছেদন করিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু বেয়ারলুটি এবং নাগালুটি গ্রামে চিগুরলা গোত্রের বয়স্ক লোক জীবজন্তুর শিরশ্ছেদনের কাজ করে।

বর্তমানে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায় রাম, অর্জুন, কৃষ্ণ, ভেঙ্কটেশ্বর প্রভৃতি দেবতার ছবি দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখে। তাহারা 'লিঙ্গমাইয়াকে' ভগবান শিব-এর সহিত এক করিয়া দেখে।

চেঞ্চুরা নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। যদি কোন সময় দেখিতে পায়, যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণযোগ্য অথবা গাভী অথবা কুকুরের চক্ষু খোলা ও স্তব্ধ অবস্থায়

এবং যদি লেজ নাড়া অবস্থায় দেখিতে পায় তখন তাহাকে শুভ বলিয়া মনে করে। আবার যদি গাভী বা কুকুর বা বিধবা নারীর সকাল বেলায় চক্ষু নড়া অবস্থায় দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাকে অশুভ বলিয়া মনে করে। যদি এপ্রিল-মে মাসে বাঘের গর্জন শুনিতে পায় তাহা হইলে সেই বৎসর ভাল বৃষ্টি হইবে মনে করে। খেঁকশিয়াল বা পেঁচার ডাক শুনিতে পাইলে অবাস্তব কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে করে। হাত হইতে খাদ্য পড়ে যাওয়ার অর্থই হইতেছে কোন আত্মীয় আসার সূচনা। তাহারা মনে করে এপ্রিল হইতে আগস্ট মাস বিবাহের পক্ষে সৌভাগ্যজনক। মঙ্গলবার, বুধবার, শুক্রবার এবং শনিবার যাত্রা অশুভ বলিয়া মনে করে। বৃহস্পতিবার এবং রবিবার যাত্রার পক্ষে শুভ বলিয়া মনে করে।

কু-দৃষ্টির আক্রমণ দূর করার জন্য হলুদের গুঁড়া গরম জলে মিশ্রিত করে, যদি ইহা লাল রঙ হয় তাহা হইলে মনে করে কু-দৃষ্টি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছে তখন ঐ রঙ-এর জলে ঢেউ দেয় যাহাতে কু-আক্রমণ দূর হয়। যদি রঙ লাল না হইয়া অন্য রঙ অর্থাৎ হলুদ হয় তাহা হইলে বুঝিবে কু-দৃষ্টি আক্রমণ করে নাই।

চেঞ্চুরা বেশীর ভাগই হিন্দু উৎসব পালন করে তাহারা উগাদি, নাগুলাক, দশেরা, সংক্রান্তি, শিবরাত্রি প্রভৃতি উৎসব পালন করে। কেউ কেউ দীপাবলি উৎসব পালন করে। উগাদি নববর্ষ উৎসবের দিন কেউ কেউ শ্রীসাইলমের আম্বা উৎসব দর্শন করে। ঐ দিনই পেড্ডাম্মা দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেয় এবং ভোজসভার আয়োজন করে। দশেরা পূজার দিন 'জাম্মি' গাছকে পূজা করে এবং পূজার সময় একটি নারিকেল ভাঙ্গা হয়। ঐ দিন নূতন কাপড় পরিধান করে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতেছে পায়স রান্না করিয়া খাওয়া এবং মাদকদ্রব্য পান করিয়া আনন্দ উপভোগ করা।

চেঞ্চুদের জন্য কল্যাণ—১৯৪২ সালে অমরাবাদ চেঞ্চু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই সময় নীজাম সরকার চেঞ্চুদের সংরক্ষণের জন্য ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কার্যকরী হয় ১৯৪৩ সালে। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হইল :—

(১) ৭৫০,০০০ একর জায়গা চেঞ্চুদের জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) এই অঞ্চলে চেঞ্চুদের শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য কাহারও অনুমতির প্রয়োজন হইবে না।

(৩) যে সকল অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করে তাহা ন্যায্য দামে সরকারী পরিচালকমণ্ডলী ক্রয় করে এবং তাহাদিগকে ন্যায্য দামে খাদ্যশস্য, ডাল, তেল, লবণ সরবরাহ করে।

(৪) অন্য কোন বাহিরের দাদনদার ও মহাজন, সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রবেশ নিষেধ ছিল।

(৫) চেঞ্চুদের জন্য মজুরী, ফরেস্ট কন্‌ট্রাক্টরদের নিকট নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৬) বনবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলের পরিদর্শক (watchman) হিসাবে অন্যান্য আদিবাসীদের অপসারিত করিয়া চেঞ্চুদের নিয়োগ করা।

(৭) চেঞ্চুদের যাহাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা।

(৮) এই সকল কল্যাণমূলক কাজ, যে সকল চেঞ্চু, সংরক্ষিত অঞ্চলের বাহিরে বাস করিত এবং কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করিত তাহাদের জন্যও প্রযোজ্য হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার চেঞ্চুদের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ১০০টি পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এই উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নাগালুটি, বেয়ারলুটি অঞ্চলে "Land Colonization Of Chenchus"-এর অধীনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা মূলতঃ চেঞ্চুদের স্থায়ী চাষী করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়:—

(১) ৫০০ একর চাষের জমি চেঞ্চুদের মধ্যে বিতরণ করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারে ৫ একর করিয়া জমি পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে চার বিঘা উচ্চ ডাঙ্গা জমি এবং এক একর জলা জমি প্রত্যেক চেঞ্চু পরিবার পাইয়াছে।

(২) সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) প্রত্যেক পরিবারের ১টি করিয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

(৪) প্রত্যেক পরিবারকে এক জোড়া করিয়া বলদ দেওয়া হয়।

(৫) কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

(৬) উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ করা হয়।

(৭) কুঁয়া খনন করা হয়।

(৮) দেখাশুনার জন্য অফিস এবং উৎপন্ন দ্রব্য মজুত রাখার জন্য আড়ত ঘর তৈয়ারী করা হয়।

(৯) কর্মীদের আবাসগৃহ তৈয়ারী করা হয়।

(১০) নাগরিকত্ব বিষয়ে সচেতন করার ব্যবস্থা হয়।

এই পরিকল্পনায় ১০০টি পরিবারের জন্য ঘর তৈয়ারী করা হয় কিন্তু মাত্র ৪০টি পরিবার বসতি স্থাপন করে। ১,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে ৫০০ একরের পরিবর্তে ১৫০ একর জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, জলসেচের জন্য পুকুর খনন করা হইয়াছিল, কুড়ি জোড়া বলদ ক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ইহা পরীক্ষা স্বরূপ হিসাবে বিতরণ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোন পরিবারই ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। উপরন্তু তাহারা এই কলোনী ঘরগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরুষানুক্রমিক গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। চেঞ্চুদের প্রতিটি পরিবারকে বিশেষ বিশেষ সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে।

খাদ্যান্বেষণ ও কৃষিজীবী

লোধা (The Lodha)

ইতিহাসের বেগবান স্রোতে অরণ্যাচারী লোধা জীবনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিকার, ফলমূল আহরণ ও কৃষি নানাভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। লোধারা নিজেদের শবর বলিয়া থাকে। যদিও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে শবররা লোধাদের চেয়ে উঁচু জাতের বলিয়া মনে করে। রামায়ণে শবরীর উল্লেখ রহিয়াছে। লোধা শব্দটি সম্ভবতঃ লুব্ধক শব্দ হইতে আসিয়াছে। লুব্ধক তাদেরই বলা হয় যাহারা ফাঁদ পাতিয়া পাখি বা জীবজন্তু ধরে।

লোধাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর গবেষণা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক।

লোকসংখ্যা: ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের সংখ্যা ছিল ৮,৩৪৮। এর ৭২.৩ শতাংশ বাস করে মেদিনীপুর জেলায় এবং ২৪.৭ শতাংশ বাস করে হুগলী জেলায়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত লোধাদের 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। সেই বৎসরই আইন করিয়া ইহাদের তপশীলী উপজাতি হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে তপশীলী হিসাবে লোধা, খাড়িয়া বা খেড়িয়া উপজাতিদের একই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে যদিও লোধা এবং খাড়িয়াদের সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৬১-তে মোট ইহাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,৮৯৮। খাড়িয়া মূলতঃ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় বাস করিলেও ইহাদের কিছু কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় বাস করিতেছে। অধ্যাপক ভৌমিকের মতে লোধাদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। ময়ূরভঞ্জে দুই হাজার ও বিহারের সিংভূমে প্রায় এক হাজার।

লোধাদের আদিনিবাস—ইহাদের আদিনিবাস সম্পর্কে ১৯০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইহারা মূলতঃ মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে লোধা নামে এক কৃষিজীবী গোষ্ঠী দেখা যায় ৮

জেলাশাসক মনে করিয়াছিলেন রিস্‌লে তাঁর গ্রন্থে যাহাদের শবর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, এরা তাহাদেরই স্বজাতি। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের শবররা লোধাদের হইতে উঁচু জাত বলিয়া মনে করে। মেদিনীপুর শহরের চিড়িমারদের এই আদিবাসীদের একটি শাখা বলিয়া গণ্য করা হয়। অধ্যাপক ভৌমিকের মতে সুদূর অতীতে দক্ষিণ হইতে আগত এই অরণ্যচারী গোষ্ঠী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে আসিয়া স্থায়ী হয়। ইহাই তাহাদের আদি নিবাস বলা যাইতে পারে। মধ্যপ্রদেশের লোধাদের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। লোধারা শবর বা লোধা-শবর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহারা মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমের অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এবং বিহারের সিংভূমে বাস করে। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করিয়া ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও মেদিনীপুর সদর মহকুমাতে ইহাদের বসবাস করিতে দেখা যায়। পশ্চিমের শাল পিয়াশাল মহুয়ার জঙ্গল। আর আছে আম, কাঁঠাল। চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল, শিয়াল, নেকড়েবাঘ, শূকর, নানাবিধ সাপ প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান জীবজন্তু, সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে লোধাদের বাস। কখনও ইহারা অন্যান্য হিন্দু গ্রামের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে বাস করে, আবার কখনও বা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কড়া, মাহালী প্রভৃতি উপজাতির সহিত পরস্পর একই গ্রামে বাস করে।

ডঃ শশাঙ্কশেখর সরকারের মতে লোধারা ভেদ্দা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। লোধা পুরুষদের গড় উচ্চতা ১৫৯'১ সে. মি.। স্ত্রীদের উচ্চতা ১৪৯'৪ সে. মি.। ইহাদের গায়ের রং কালো, চোখের রং কালো বাদামী, ভ্রুর অস্থিরেখা স্পষ্ট বোঝা যায়। চুলের গঠন ঢেউ খেলান, চুলের ঘনত্ব মাঝামাঝি ও পুরুত্ব মাঝামাঝি, চুলের রং কালো। ঠোঁট মাঝারি গঠন, উল্টান নয়। মাথার গঠন লম্বা মাথা হইতে চওড়া মাথা।

ভাষা— লোধারা ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষায় কথা বলে। ইহার সহিত ওড়িয়া ভাষার মিশ্রণ রহিয়াছে।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

পেশা—লোধাদের মধ্যে কৃষিকাজের অভ্যাস ছিল না। ইহারা অরণ্যবাসী গোষ্ঠী সেইজন্য তাহারা বনজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিত। জঙ্গল হইতে ফলমূল সংগ্রহ করা এবং শিকার করা ইহাদের জীবনের প্রধান জীবিকা, কিন্তু 'বন-সংরক্ষণ' আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ইহারা বিপদে পড়িল। তখন জঙ্গলের সুযোগসুবিধা হইতে বিচ্যুত হইল। ফলে না পাইল বনজ সম্পদ এবং না পাইল বনে জঙ্গলে শিকার। পেটের ক্ষুধাই ইহাদের আস্তে আস্তে টানিতে লাগিল চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ-জনিত কর্মের দিকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাহাদের স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি হিসাবে ঘোষণা করিল। 'অপরাধ' জাতি হিসাবে আখ্যা পাওয়ায় লোধাদিগকে কোন গৃহস্থেরা কাজকর্ম দিতে চাহিত না। এর ফলে পেটের জ্বালায় ছাগল, মুরগী বাসনকোসন সুযোগ পাওয়া মাত্র চুরি করিত। তাহাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে কোন কোন অবস্থাপন্ন ধূর্ত লোক ইহাদের চুরি করিতে উস্কানি দিত এবং লোধারা ঐ সকল লোকের কাছে সস্তায় জিনিসগুলো বিক্রয় করিত।

বর্তমানে ইহারা বনজ জিনিস সংগ্রহ, কৃষিকার্য ও কৃষিমজুর হিসাবে কাজ করে। এবং সময় সময় শিকার এবং মৎস্য শিকার ইহাদের জীবনের জীবিকা। ১৯৭১ সালের আদমসুমারীতে ইহাদের ১৭ শতাংশ চাষী, ৫৮ শতাংশ ক্ষেতমজুর, ১৮ শতাংশ বনজ জিনিসপত্র সংগ্রহ এবং নানা প্রকার মজুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

কৃষিকার্য—বর্তমানে লোধারা কৃষিকার্যে উৎসাহী হইয়াছে। বিশেষ করিয়া যে সকল লোধা মেদিনীপুর সদর মহকুমায় ডহরপুর, বীরকাড় ; ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কুকাই, জারললতা, পাথরডহরা প্রভৃতি গ্রামে বাস করে। লোধারা বৎসরের অধিকাংশ সময় চাষের মজুরীতে নিযুক্ত থাকে। জমি সাধারণত নিজস্ব কিংবা সরকার হইতে পাওয়া অথবা অন্যান্য জোতদারের নিকট হইতে বর্গা চাষের জন্য লওয়া। ইহারা জমিকে দুইভাগে ভাগ করে। বাড়ীর সংলগ্ন উচ্চ জমিকে 'দোয়েম' বলে যেখানে ইহারা ভুট্টা, তুলা নানাবিধ শাক-সব্জির চাষ করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নীচু জলা জমিকে বলে 'সোয়েম'। এই জমিতে ধান চাষ করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণত দুই পদ্ধতিতে ধান চাষ করে। বপন পদ্ধতি এবং রোপণ পদ্ধতি। যে

সকল জমিতে বেশী জল জমিয়া থাকে এবং বর্ষায় জলে জমি ভর্তি থাকে তখন লাঙল করার পক্ষে অসুবিধা হইয়া পড়ে। ফলে বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে লাঙল দেওয়ার পর ধান ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এবং শীতকালে শস্য পাকিয়া উঠিলে শস্য কাটিয়া লইয়া আসে। অপরপক্ষে বেশীর ভাগ জমি রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করে। জমিতে কয়েকবার লাঙল দেওয়ার পর একখণ্ড ছোট জমিতে বীজতলা (Seed bed) তৈয়ারী করে। বীজ ৪"-৬" লম্বা হইলে অন্যত্র বড় জমিতে কয়েকবার কাদায় লাঙল করার পর মই দ্বারা সমতল করিয়া একফুট অন্তর গুচ্ছাকারে রোপণ করে। তারপর শীতকালে ধান পাকিলে ধান কাটিয়া গৃহে লইয়া আসে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম থানার গভীর জঙ্গলের লোধারা জুন-জুলাই মাসে জঙ্গলকে পরিষ্কার করিয়া রাখে এবং কোদাল দ্বারা মাটি কুপাইয়া রাখে এবং ঠিক বর্ষার প্রারম্ভে শিম (Bean) বপন করিয়া দেয়। শিম চাষ করিয়া বৎসরের কিছু দিন কাটাইতে পারে।

মজুর—যে সকল লোধা ভূমিহীন তাহারা প্রতিবেশী জোতদারের জমিতে কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করে। ইহাদের শিল্প শ্রমিক হিসাবেও কাজ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া রেললাইন তৈয়ারী করিতে এবং রেললাইন মেরামতের কাজে নিযুক্ত থাকে।

শিকার—শিকার এক সময় ইহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। এখনও ইহারা অধিকাংশ সময় জঙ্গলে শিকারে বাহির হয়। দলবদ্ধভাবে শিকার ইহাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। বন্যশূকর, খরগোস এবং নানা জাতীয় পাখী শিকার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া গিরগিটি, গোধিকা, ইঁদুর এবং ঢ্যামনা বা দাঁড়াশ সাপ শিকারের বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয়। মৎস্যশিকার ইহাদের আর এক জীবিকা। বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে এবং হেমন্তকালে ধানক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে মাছ জন্মায়। ঐ সকল মাছ খালি হাত দ্বারা অথবা জাল ও ফাঁদ দ্বারা ধরিয়া প্রতিবেশী গোষ্ঠী ও বাজারে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। কচ্ছপ শিকার আর এক জীবিকা। জলা জায়গায় ও কাদার মধ্যে লম্বা বাঁশের সূঁচাল যন্ত্রদ্বারা কচ্ছপের সন্ধান করে এবং হাত দ্বারা ধরিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া শামুক, গুগ্‌লি সংগ্রহ করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিয়া থাকে।

খাদ্যসংগ্রহ—ভাদ্র ও আশ্বিন (সেপ্টেম্বর—অক্টোবর) মাসে যখন কোন কাজ থাকে না এবং জীবিকার অন্য উপায় থাকে না তখন দল বাঁধিয়া জঙ্গলে ফলমূল সংগ্রহে বাহির হয়। 'চিরকা-আলু' জঙ্গলে যাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাঠ, কেঁদ পাতা সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা ইহাদের আর এক জীবিকা। ইহারা সময় সময় মধুও সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধু সংগ্রহের সময় একপ্রকার পাতার রস সারা দেহে মাখিয়া মধু সংগ্রহ করে। তাহা ছাড়া তসরের গুটিপোকা সংগ্রহ করা আর এক জীবিকা। দাঁড়াশ, গোখিকা সাপের চামড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকার সন্ধান পাইয়াছে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—প্রধান চাষের যন্ত্র হইল লাঙল। ইহারা লাঙলকে 'হাল' বলে। ইহা শাল কাঠের তৈয়ারী এবং লাঙলের ফলা লোহার তৈয়ারী। জোয়াল যাহা দুইটি গরুর কাঁধের উপর থাকে এবং একটি দড়ির সাহায্যে লাঙলের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। মই বা পাটা দ্বারা জমি সমতল করা হয়। লাঙল-জোয়াল ছাড়াও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান হইল কোদাল (Hoe), কাস্তে, দা ইত্যাদি। উদুখল (Motar and Pestle) বা ছিয়া দ্বারা ধান কুটার কাজ হয়। ঢেঁকির ব্যবহারও দেখা যায়।

শিকারের জন্য তীর ধনুক হইল প্রধান অস্ত্র। ধনুক অর্ধ বাঁশের তৈয়ারী যাহার মাঝখানটা মোটা ও দুই প্রান্ত সরু হইয়া শিং (Horn) তৈয়ারী করিয়াছে। বাঁশের ছিল্‌কা গুণের (String) কাজ করে। ধনুকে যখন টান দেওয়া হয় তখন দেখিতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

তীরের দুইটি অংশ। বাঁশের তৈয়ারী দণ্ড ও লোহার তৈয়ারী ফলা। ফলার অগ্রভাগ সূঁচাল এবং অপর প্রান্তে দুইটি খাঁজ (Barb) থাকে। দণ্ডের একপ্রান্ত ফলার মধ্যে ঢোকান থাকে। অপর প্রান্তে একটি খাঁজ থাকে, ধনুকের ছিল্‌কাতে আটকানোর জন্য। তীরে পালক আটকানো থাকে যাহাতে সহজে বাতাস কাটিয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া টাঙি, কুঠার, বল্লম প্রভৃতি ব্যবহার করে। তাহাছাড়া স্বয়ংক্রিয় ফাঁদ দ্বারা শিকার করে। আঠাকাঠি দ্বারা শিকার করিতে খুবই পটু। কয়েকটি কাঠির অগ্রভাগে

আঠা মাখাইয়া বৃত্তাকারে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে এবং মধ্যস্থলে খাদ্যবস্তু ছড়াইয়া রাখে। খাদ্যের লোভে পাখীর দল আসিয়া বসিলে আঠা পালকে জড়াইয়া যায়। এই ভাবে পাখী ধরা পড়ে। মৎস্য শিকারের জন্য নানাধরনের জাল যেমন ছাকনি, কই জাল ও নানাপ্রকার ফাঁদ, ঘুনি ব্যবহার করে। কচ্ছপ শিকারের জন্য ছুঁচাল বাঁশ ব্যবহার করে।

গৃহপালিত পশু—গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল প্রভৃতি পালন করে। হাঁস, মুরগীও পালন করিয়া থাকে। গরু, মহিষ, চাষের কাজে লাগে। ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী খাদ্যের জন্য পালন করে। অনেকে কুকুরকে শিকারের সময় কাজে লাগায় এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পোষ মানায়।

খাদ্য—লোধাদের ভাতই প্রধান খাদ্য। সকাল প্রায় আটটার সময় পান্তা ভাত খায় যাহা সারারাত্রি জলে ভিজান থাকে। পান্তাভাতের সঙ্গে লবণ, লঙ্কা এবং তরকারী খায়। সাধারণত শাক-সব্জির তরকারী তৈয়ারী করে। সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটার সময় দৈনন্দিন প্রধান খাদ্য খায়। এই সময় গরম ভাত এবং তার সঙ্গে তরকারী মাছ ও মাংস খায়। মাংস বলিতে গোধিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কচ্ছপ ও নানা প্রকার পাখী, ছাগল ও ভেড়ার মাংস বুঝায়। তাহাছাড়া বন্য আলু ও মূল সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। ইহারা দিনে একবার মাত্র রান্না করে। ভাতকে পচাইয়া হাঁড়িয়া তৈয়ারী করিয়া খাওয়া তাহাদের দৈনন্দিন অভ্যাস। মহুয়া হইতে মদও তৈয়ারী করিয়া খায়।

আগুন জ্বালান পদ্ধতি—ইহারা কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত। পরবর্তী সময়ে চকমকির সাহায্যে আগুন জ্বালানর পদ্ধতি গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানে সকলেই দেশলাই ও লাইটার জ্বালাইয়া আগুন জ্বালানর পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। শীতকালে রাত্রিতে ঘরের অভ্যন্তর গরম রাখার জন্য ঘরের এক কোণে গর্তে কাষ্ঠ জ্বালাইয়া রাখে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—লোধারা গ্রামে বাস করে। সাধারণত দুই ধরনের গ্রাম দেখা যায়। প্রথমত এক ধরনের গ্রাম যেখানে হিন্দু ও অন্যান্য জাতির বাস অর্থাৎ সংক্রান্ত লোকালয়ের মধ্যে। অপর এক

ধরনের গ্রাম যাহা অন্যান্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র ও অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে। গ্রামের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। কৃষি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট ও গলিপথ থাকে কিন্তু অরণ্যসঙ্কুল গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট নাই কেবলমাত্র পায়ে হাঁটা অমসৃণ, অসমতল পথ ইতস্ততঃ ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই সকল গ্রামে ঝরনার জল বাঁধ দ্বারা আটকাইয়া কৃত্রিম জলাশয় তৈয়ারী করে। কিন্তু অন্যান্য গ্রামগুলিতে কূপ ও ইঁদারা এমন কি নলকূপও দেখা যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে 'বড়াম', 'চণ্ডী', 'শীতলা থান' থাকে। এই পূজা থানগুলিকেই সভা সমিতির জায়গা হিসাবে কাজে লাগায়। বর্তমানে কোন কোন গ্রামে প্রাইমারী বিদ্যালয়ও চোখে পড়ে।

যে সকল লোধারা জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে বাস করে তাহাদের ঘরগুলি কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনাভাবে তৈয়ারী নয়। ঘরগুলি ছোট আয়তাকৃতি এবং মাটির চারিটি দেওয়াল তৈয়ারী করা হয় ও পরে কাদামাটি ও গোবর দ্বারা প্রলেপ দেয়। ঘরের চালের গঠন তৈয়ারী করে ঢালুভাবে নানা প্রকার গাছের ডাল ও বাঁশের দ্বারা। গাছের ডাল ও বাঁশগুলি 'সাবুই' ঘাসের দড়ি দিয়া শক্ত ভাবে বাঁধে। তারপর খড় বা পাতা দ্বারা ছাউনি তৈয়ারী করে। অরণ্যবাসী লোধাদের মধ্যে কখনও কখনও দু-একখানা মাটির দেওয়াল যুক্ত বড় ঘরও দেখা যায়। প্রায় অধিকাংশ ঘরগুলিতে কোন জানালা থাকে না। কেবলমাত্র একটি ছোট দরজা থাকে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শরীরের অর্ধেকটা নীচু হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য দরজাতে একটি আলগা আগড় থাকে যাহা সহজেই তুলিয়া অন্যত্র সরাইয়া রাখা যায়। ঘরের উনানের সামনে একটি মাটির ঢিবি তৈয়ারী করে যাহাকে 'ঈশান' বলে সেখানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করা হয়। অধিকাংশ ঘরগুলিই ইতস্ততঃ ভাবে বিন্যস্ত। ঘরের সম্মুখভাগের অবস্থানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। যে কোন দিকে ঘরের দরজা থাকে। কিন্তু কৃষিগোষ্ঠী লোধাদের ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের। এক একটি পরিবারের একখানি ঘর থাকে। ঘরের একের বেশী কামরা থাকে এবং ঘরগুলির দেওয়াল মাটির তৈয়ারী এবং খড় দ্বারা ছাওয়া। ঘরগুলি উঁচু ভিত্তির উপর অবস্থিত এবং দরজা, জানালা বর্তমান ও ইহাদের কপাট থাকে। কোন কোন কৃষি পরিবারের ঘরের সামনে উঠান থাকে ও পাশে থাকে সব্জি

বাগান। ঘরের সীমানাতে কাঁটাবাঁশের বেড়া থাকে। যদিও গরু ও ছাগল রাখার কোন আলাদা ঘর থাকে না তথাপি ঐ সকল গৃহপালিত জন্তু ঘরেরই বারান্দায় রাখার ব্যবস্থা করে। কৃষি যন্ত্রপাতিও ঘরের এক কোণায় রাখে।

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র—লোধাদের ঘরের ব্যবহৃত আসবাবপত্র বিশেষ কিছু থাকে না। রান্না করার জন্য মাটির হাঁড়ি বা পাত্রই যথেষ্ট। তাহাছাড়া লোহার কড়া, অথবা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ও থালা ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সমস্ত লোধাদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকে তাহারা কাঁসার বাসন ব্যবহার করে।

ইহারা নাচ ও গানের জন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। ইহাদের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র 'চাঙ্গল' বা চাঙু। ইহা গোলাকৃতি এবং একদিক চামড়া দ্বারা ছাওয়া।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—প্রত্যেক লোধা পুরুষের একখানি মোটা পরিধের ধুতি এবং দু-খণ্ড গামছা থাকে। সার্ট এবং চাদর সকল লোধা পুরুষদের থাকে না। একখানা ধুতি অথবা একখানা গামছা যথেষ্ট। সেইজন্য সহজেই ময়লা হইয়া যায় সেই ময়লা পরিধান পরিয়া থাকে। প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ থাকে। কখনও কখনও একখণ্ড কাপড়কে সামনের দিক হইতে পিছনের দিকে কোমরে জড়ান ঘুন্‌সিতে আটকাইয়া রাখে। মেয়েরা শাড়ী পরিধান করে। কিন্তু একজন মেয়ের একটির বেশী শাড়ী থাকে না। বর্তমানে মেয়েরা ব্লাউজ ও সায়া পরিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একখানি শাড়ীকে কোমরে জড়াইয়া অপর প্রান্ত সামনের দিকে লইয়া গিয়া কাঁধের উপর পিছন দিকে ঝুলাইয়া রাখে। মেয়েরা জার্মান সিল্‌ভারের গহনা অথবা পুঁতির হার ব্যবহার করে। মেয়েরা সারা শরীরে বিশেষ করিয়া বাহু ও বক্ষস্থলে নানা ফুলের উল্কী কাটে। সোনা ও রূপার গহনা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া ব্যবহার করিতে পারে না তথাপি কোন কোন গ্রামে পরিবারের মধ্যে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মেয়েরা মাথা আঁচড়াইয়া ও খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

হস্তশিল্প ও কারুকার্য—ইহারা হস্তশিল্পে খুব বেশী পটু না হইলেও ঘরের দেওয়ালগুলি নানা ফুলের ছবি অথবা পশুপক্ষীর ছবি আঁকিয়া ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। দু-একজন লোধাকে দারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে চাঙ্গলই প্রধান ও মাদলও উৎসবে ব্যবহার করে।

সামাজিকগঠন ও কার্যক্রম—লোধারা নিজদিগকে 'লোধা' নামেই পরিচিত করে। ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যে সকল লোধারা জঙ্গলের কিনারে বাস করে তাহারা নিজেদিগকে লোধা নামে পরিচয় দিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। আবার যে সকল লোধা গ্রামে অন্যান্য জাতির সহিত বাস করে তাহারা নিজেরা 'শবর' বলিয়া পরিচয় দেয়।

গোত্র—লোধারা অন্তর্বিবাহ (Endogamous) মূলক উপজাতি অর্থাৎ নিজ জাতি ছাড়া বিবাহ করে না। তবে ইহার ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। সমগ্র উপজাতিটি নয়টি গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব গোত্র দেবতা বা কুলকেতু (Totem) থাকে। গোত্র দেবতাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং গোত্রের নামে ধর্মীয় বাধানিষেধ (Taboo) মানিয়া চলে। গোত্রগুলি বহির্বিবাহ (Exogamous) মূলক সংস্থা অর্থাৎ নিজ গোত্রে বিবাহ করা নিষেধ এবং সামাজিক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। লোধাদের গোত্র পিতৃকেন্দ্রিক অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গোত্র পাইয়া থাকে। কোন স্ত্রী অবিবাহিত অবস্থায় পিতার মৃত্যু হইলে এগার দিন অশৌচ পালন করে কিন্তু বিবাহের পর অপর গোত্রে চলিয়া যাওয়ার জন্য পিতার মৃত্যুতে তিনদিন অশৌচ পালন করে। কিন্তু স্বামীর গোত্রের কাহারও মৃত্যু হইলে এগার দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে।

নয়টি গোত্রের সহিত যে সকল গোত্র দেবতা সম্পর্কিত তাহা নিম্নরূপ :

গোত্রের নাম	গোত্র দেবতার নাম
ভক্তা	চিঁবুকা-আলু
মল্লিক	মকর অর্থাৎ হাঙ্গর
কোটাল	চন্দ্র এবং গঙ্গা ফড়িং
নায়েক বা লায়েক	শালমাছ
দীগার	ভেক
পরামাণিক	মানিক পাখী
দণ্ডপাট বা বাঘ	বাঘ
আহারী বা আড়ি	চাঁদামাছ
ভুঁইয়া	শালমাছ

পরিবার—পরিবার হইতেছে সমাজের ক্ষুদ্রতম সংস্থা। সমগ্র গোষ্ঠী পরিবারে বিভক্ত। পরিবারের সভ্যের ধরন অনুযায়ী পরিবারগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রাথমিক পরিবার যাহা পিতা-মাতা ও অবিবাহিত সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত। প্রাথমিক পরিবারকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) পিতামাতা ও অবিবাহিত সন্তানসন্ততি (খ) পিতামাতা ও বৃদ্ধ পিতামহ বা মাতামহ এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা (গ) পিতামাতা ও অবিবাহিত পুত্র কন্যা এবং আগের পক্ষের অবিবাহিত পুত্র কন্যা। (২) বহু পত্নী মূলক পরিবার যাহাতে একজন স্বামী ও একের বেশী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র কন্যাদের লইয়া গঠিত। (৩) তৃতীয় ধরনের পরিবার হইতেছে যৌথ পরিবার। ইহা বৃদ্ধ পিতামাতা, বিবাহিত পুত্রগণ ও তাহাদের পুত্র কন্যা লইয়া গঠিত। এই পরিবারে জামাতা, বিধবা শাশুড়ী ও তাহার পুত্র কন্যা সংযুক্ত হইতে পারে।

জীবনচক্র—লোধাদের জীবনচক্র জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত।

জন্ম—লোধারা মনে করে মাসিক বন্ধ হওয়ার কারণই হইতেছে অন্তঃসত্বা হওয়ার কারণ। তারপর বাহিরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। স্ত্রীরা সাধারণত এই সময় তাহার স্বামীর সহিত যৌন সংযোগ করিতে ইচ্ছুক হয় না। উপরন্তু তাহাকে হাল্কা ধরনের কাজ করিতে দেওয়া হয়। অন্তঃসত্বার সময় নানা রকম বাধানিষেধ মানিয়া চলে। তাহাছাড়া তাহারা দেবতার নিকট 'মানসিক' অর্থাৎ চাউল, ফলমূল, ছাগল, মুরগী উৎসর্গ করে। গর্ভধারণের সাত মাসের সময় সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করে। প্রসবের সময় শয়নঘরেরই এক কোণে ব্যবস্থা করে, অনেক সময় একটি কাপড় টাঙাইয়া দেয়। সেই সময় একজন বয়স্কা হাঁড়ি স্ত্রীলোক ধাত্রীরূপে কাজ করে। যদি প্রসব স্বাভাবিকভাবে না হয় তাহা হইলে গুনিণকে ডাকিয়া আনে। গুনিণ নানা তুক-তাক মন্ত্র দ্বারা স্বাভাবিক প্রসবের চেষ্টা করে। শিশুর জন্ম হওয়ার একুশ দিন পর 'একুশা' অনুষ্ঠান পালন করে। ঐদিন শিশু সন্তানের মা নখ কাটে, সরিষার তেল মাখে এবং স্নান করে অর্থাৎ সেই দিন পবিত্র হয়। শিশুরও নখ কাটিয়া স্নান করায়।

মুখে ভাত অনুষ্ঠান—শিশুর যখন ছয় মাস বয়স হয় তখন তাহাকে

একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা ভাত খাওয়ান পর্ব আরম্ভ হয়। সাধারণত মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের ভাল দিন। ঐ দিন পূজারী আসে এবং শীতলা ঠাকুরের থানে 'ভোগ বা খীর' তৈয়ারী করে। নূতন মাটির পাত্রে আতপচাল, দুধ, চিনি, আদা প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া ভোগ তৈয়ারী করে। সেই সঙ্গে নাপিত আসিয়া শিশুর মাথা মুণ্ডন করে এবং তেল মাখাইয়া স্নান করায়। তারপর নূতন ঘুন্‌সি ও কাঠের পুঁতির মালা পরিধান করায়। শেষে শিশুর ঠাকুমা অথবা দিদিমা ঐ উৎসর্গকৃত ভোগ মুখে ছুঁয়াইয়া দেয়। সেই দিন থেকে ভাত খাওয়ায় সামাজিক স্বীকৃতি পাইয়া থাকে।

বিবাহ—লোধাদের পিতৃপ্রধান সমাজ, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে আসিয়া বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে এক বিবাহ প্রচলিত। বহুপত্নী বিবাহ ইহাদের মধ্যে একেবারে অস্বাভাবিক নয়। জ্ঞাতি বিবাহ বা আত্মীয় বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নয়। কিন্তু গান্ধর্ব বিবাহ (Marriage by elopement) প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে যখন পরস্পর ভালবাসায় আসক্ত হয় তখন তাহারা গোপনে পলাইয়া বিবাহ করে এবং কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া আসে। শ্রম বিনিময়ে (Marriage by service), অর্থাৎ ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে কয়েক বৎসর শ্রম দানের পর বিবাহ করিবার রীতি আছে। বিনিময় প্রথায় (Marriage by exchange) অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে পাত্র পাত্রী আদান প্রদান করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। দেবরণ (Levirate) অর্থাৎ বড় ভাই-এর মৃত্যু ঘটিলে ছোট ভাই বড় ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে কিন্তু ছোট ভাই-এর মৃত্যু ঘটিলে বড় ভাই কোন সময়ই ছোট ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে না। শালীবরণ (Sororate) অর্থাৎ স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর তাহার বোনকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ হইলেও অনেক সময় দেখা যায় বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাপের বাড়িতে আসিয়া বসবাস করে এবং শ্বশুর বাড়ীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইহাদের 'ঘরজামাই' বলে।

বিবাহ অনুষ্ঠান—লোধাদের মধ্যে এক বিবাহকে প্রজাপত্য বিবাহ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হইয়া থাকে। সাধারণত অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ ঘটিয়া থাকে। যখন পাত্রের বয়স ১৫—২৫ বৎসর এবং কন্যার বয়স ১০—১২ বৎসর তখন উভয় পক্ষ থেকে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। স্বাভাবিকভাবে

পাত্র যখন ১৫—২০ বৎসরের হইয়া থাকে তখন বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ছেলেমেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ থেকে একজন ঘটক (Go-between) উভয় পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত করে। উভয় পক্ষ থেকে ছেলেমেয়ের পিতা বা আত্মীয়-স্বজন পছন্দ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করে। এই বিবাহে পাত্র, কন্যার পিতাকে কন্যাপণ স্বরূপ ১৫-২০ টাকা পণ দেয় এবং কনের ভাইকে 'শালা ধুতি', কনের মাকে 'মা-শাড়ী', কনের মামাকে 'মামা ধুতি' ও কনেকে 'কনে-শাড়ী' দিতে হয়। বিবাহের দিন বরের পিসি কনের বাড়ীতে পাঁচ খণ্ড হলুদ, সরিষার তেল, ঘুনসি, কাঠের মালা কন্যার জন্য লইয়া যায়। ইহাকে 'গায়ে হলুদ' বলে। ঐ দিন কন্যার বাড়ীতে একটি ছাদনাতলা খাটান হয় এবং তাহার মধ্যে একটি মাটির ঢিবি বা বেদী তৈয়ারী করে। ঐ বেদীর উপর মাটির জল ভর্তি ঘট ও তাহার উপর আম্রপল্লব দিয়া বসাইয়া রাখে। বিবাহের দিন রাত্রিতে পাত্র তাহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কন্যার পিতা তাহাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারপর বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সময় পুরোহিত বা দেহরী এবং বরের সম্বর বা ভগ্নীপতি অবশ্যই উপস্থিত থাকে। ছাদনাতলায় পাত্রকে পূর্বমুখে বসিতে দেয় ও পাত্রীকে পাত্রের সম্মুখে বসিতে দেয়। তারপর দুই-জন লোক একখণ্ড কাপড়কে উভয়ের মাথার উপর ধরিয়া থাকে। তখন সম্বর বরের মাথায় পাগড়ির সহিত কন্যার শাড়ীর সহিত বাঁধিয়া দেয়। সেই সঙ্গে বর এবং কনে পরস্পর পরস্পরের কপালে সিন্দুর ছোঁয়াইয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানে দেহরী ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানায় যেন বর কনে সুখে শান্তিতে থাকে। তারপর পর্দা তুলিয়া দিয়া থাকে। শেষে সকলে মিলিয়া একত্রে ভোজন করিয়া থাকে। পরের দিন সকালে বর কনে ও তাহাদের দলবল লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বর বাড়ীতে কনের হাতে একটি লোহার বালা পরাইয়া দেয় এবং উভয়ে হাতে পবিত্র সূতা পরিধান করে। সেইদিন গ্রামকে একটি ভোজ দিয়া থাকে।

শাঙাবিবাহ লোধাদের মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রী বিবাহ করিলে শাঙাবিবাহ বলে। অনেক সময় শাঙাবিবাহের পূর্বে পুরুষেরা একটি আমগাছ এবং স্ত্রীরা একটি মহুয়া গাছকে বিবাহ করে। ইহাকে 'গাছ বিবাহ' বলে। গাছের চতুর্দিকে তিনবার ঘুরিয়া ও তিনটি

সিন্দুর ফোঁটা দিলেই বিবাহ পর্ব সারা হয়। তৃতীয়বার শাঙা হওয়ার পূর্বে গাছ বিবাহ প্রচলিত রীতি; যাহাতে পুনরায় শাঙা করার সম্ভাবনা না আসে।

পুনঃবিবাহ লোধা সমাজে আর এক প্রচলিত রীতি। বিবাহের পর যদি কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা না হয় অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে ঋতু না হইয়া থাকে তাহা হইলে, বিবাহের পর যতদিন না ঋতু হয় ততদিন স্বামীর নিকট সহবাস করিবার অনুমতি পায় না। বিবাহের পর ঋতু হইলে স্ত্রীকে সাত-দিন কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গোপনে থাকিতে হয়। সাতদিন পর স্বামীর বাড়ীতে একটি অনুষ্ঠান হয়। সকলের উপস্থিতিতে স্বামীর বাড়ীর উঠানে স্বামী স্ত্রী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং একটি কাপড় উভয়ের মাথায় ঢাকা দেওয়া হয় তারপর একটি লাল ও সাদা ফুল পরস্পরের মধ্যে তিনবার আদান প্রদান করে। ইহাকে 'ফুল দেখান' অনুষ্ঠান বলে। ইহার পর তাহারা সহবাসের সামাজিক অনুমতি পায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ—লোধা সমাজে বিবাহ বন্ধনছেদ অতি সহজেই হইয়া থাকে। বিচ্ছেদের জন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। স্ত্রী যদি অলস এবং ব্যাভি-চারিণী হয় তাহা হইলে স্বামী তাহাকে সহজেই পরিত্যাগ করে। কিন্তু স্ত্রী তাহার স্বামীকে বিচ্ছেদ করে তাহা নয়, সে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে চায় না। সে কোন এক সময়ে তার পিত্রালয়ে চলিয়া যায় এবং তাহার পিতামাতার নিকট শ্বশুর বাড়ীর নানা নির্যাতনের কথা তুলিয়া ধরে। স্বাভাবিকভাবে পিতামাতা বিবাহিত কন্যার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া স্বামীর গৃহে পাঠায় না। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী নাবালিকা হইলে স্বামী তাঁহার দৈনন্দিন যৌন পিপাসা মিটাইতে পারে না। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। স্বভাবতই স্ত্রী স্বামীর গৃহ হইতে গোপনে পিত্রালয়ে পলাইয়া যায়। আর স্বামীর গৃহে আসে না। এইভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

মৃত্যু—মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা যে দিন যাহার মৃত্যু আছে সেদিন ঘটিবেই। ইহাতে কাহারও হাত নাই। মৃত্যুর সঙ্গে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। তাহাদের বংশানুক্রমিক ধারা অনুসারে দুই উপায়ে মৃতদেহকে সৎকার করে এবং ইহা নির্ভর করে মৃত্যুর কারণ অনুযায়ী। মৃত্যু নানা কারণে ঘটিয়া

থাকে। সাপের কামড়ে, বন্যজন্তুর আক্রমণে, সংক্রামক ব্যাধিতে, প্রসব হওয়ার সময়, অথবা বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদি। ইহারা মৃতদেহকে কবর অথবা দাহ করে। সাধারণতঃ সংক্রামক ব্যাধি, শিশু মৃত্যুতে কবর দিয়া থাকে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে দাহ করে। বৃদ্ধ বয়সে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে ওঝা আসিয়া নানারকম গাছ গাছড়ার ওষুধ দিয়া সারাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে কিন্তু ইহাতে তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখে জল দেয় পরে অন্যান্য সকলে জল দেয়। ইহাকে তাহারা স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মনে করে।

প্রথমে মৃতদেহ একটি চাটাই-এর উপর শুয়াইয়া তাহাতে একটি পুরান কাপড় ঢাকা দেয়। ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন সকলে উপস্থিত থাকে। তারপর গ্রামের মাতব্বরদের উপদেশ মত ছেলেরা বা আত্মীয়রা সৎকারের ব্যবস্থা করে। মৃতদেহের মাথার নিকট একটি কাস্তে রাখে যাহাতে কোন দুষ্ট ভূত আক্রমণ না করে। অপরদিকে মৃতদেহ বহনের জন্য খাটিয়া (bier) প্রস্তুত করে। দুটি লম্বা বাঁশের দণ্ডে আড়াআড়িভাবে কয়েকটি বাঁশ বাঁধা হয়। তারপর মৃতদেহকে ঐ খাটিয়ার উপরে শুয়াইয়া উপরে কাপড় ঢাকা অবস্থায় বাঁধে এবং পুত্র অথবা ভাই অথবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের মধ্যে চারজন কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া আসে। লোধা-দের নির্দিষ্ট কোন শ্মশানভূমি নাই। যে কোন জঙ্গল কিনারে শ্মশান ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। শ্মশানে পৌঁছানর পর একজন খাটিয়াকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং যেখানে দাহ করা হইবে সেখানে তিন ফুট চওড়া, ছয় ফুট লম্বা ও ছয় ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট গর্ত করে। গর্ত করার সময় প্রথম আঘাত করে জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা কোন রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়। তারপর ইহার উপর কাঠ সাজাইয়া তাহার উপর মৃতদেহকে উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুয়াইয়া রাখে। এদিকে মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রর হাতে এক গোছা জলন্ত খড় লইয়া হাতে দেয় তাহাকে 'মুখাগ্নি' করিতে বলে। সেই জলন্ত খড় লইয়া বলে, 'পিতা বা মাতা আমি তোমার মুখে আগুন দিতেছি, ইহাই আমার কাজ'। এইভাবে অগ্নি সংযোগ করিবার পর অন্যান্য সকলে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। পুড়ান শেষ হওয়ার পর বাড়ী ফেরার পথে গাছের সহিত মৃতের খাটিয়ার দড়ি বাঁধিয়া রাখে। দাহকারী লোকেরা দড়ি পার হইয়া আসে এবং মৃতের উদ্দেশ্যে বলে 'তোমার আসার পথে কাঁটা দেওয়া হইল'

অর্থাৎ ভূত হইয়া যেন আসিতে না পারে। তারপর সকলে মিলিয়া পুকুরে বা নদীতে স্নান করে শেষবারের মত তিনবার 'হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করে। স্নান সারিয়া মৃতের বাড়ীতে আসে এবং সেখানে প্রজ্বলিত মাটির পাত্রের চতুর্দিকে বসে তাহাতে মৃত পরিবারের স্ত্রীলোকের এক গোছা চুল সেই আগুনে দিয়া হাতে মুখে তাপ দেয়। এইভাবে কাজ শেষ হয়। মৃতের রক্ত সম্বন্ধীয় লোকেরা দশ দিন অশৌচ পালন করে এবং এই দশদিনের প্রত্যেক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃতের উদ্দেশ্যে নূতন হাঁড়িতে ভাত রান্না করিয়া জলে উৎসর্গ করে। দশদিনের দিন মৃত ব্যক্তির সকলে পুকুরে অথবা নদীর ধারে আসিয়া সমবেত হয় এবং নাপিত আসিয়া চুল কাটে ও পুত্রদের মাথা মুণ্ডন করে। ইহার জন্য ধোপা ও নাপিত দু টাকা করিয়া নগদ পায়। এগার দিনের দিন শ্রাদ্ধ পালন করে। যে স্থানে মারা যায় সেই জায়গায় বৈষ্ণব আসিয়া আমপাতা ও ঘি পোড়ায়। ইহার জন্য এক টাকা পায় এবং ঐ স্থানে নূতন উনান করিয়া ভাত রান্না করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃতের উদ্দেশ্যে খাইতে দেয়। অপরদিকে মৃতসৎকার ব্যক্তিদের ও গ্রামের লোকেদের ভোজনের ব্যবস্থা করে। পরের দিন মৃতের উৎসর্গকৃত ভাত জলে ফেলিয়া দেয়। এইভাবে শ্রাদ্ধ কাজ শেষ হয়।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহাকে কবর দেওয়ার প্রথা লোধা সমাজে প্রচলিত। মৃত্যু হওয়ার পর বৃদ্ধা মেয়েরা পায়ে আলতা ও মাথায় সিন্দুর দেয়। তারপর তাহাকে শ্মশানে লইয়া আসে ও সঙ্গে একটি ছুরি লয়। ঐ ছুরি দ্বারা পেট কাটিয়া ভ্রূণকে বাহির করিয়া আনে। তারপর পূর্বমুখ করিয়া তাহাকে মাটিতে কবর দেয়। পুনরায় তাহারই পাশে গর্ত করিয়া ভ্রূণকে কবর দেয়। এই ছুরিকা গুণিনরা লইবার চেষ্টা করে তাহাদের তুক্-তাক্ ইন্দ্রজালের কাজে লাগাইবার জন্য। একই রকম ভাবে মৃতের পরিবার অশৌচ ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করে। শিশুর মৃত্যু হইলে লোধা নিয়ম অনুযায়ী শিশুকে কবর দেয়। এক্ষেত্রে তিনদিন অথবা পাঁচদিন অশৌচ পালন করে। তিনদিন অথবা পাঁচদিনের দিন নাপিত আসিয়া নখ চুল কাটে এবং স্নান করে। ধোপা আসিয়া কাপড় কাচে। এইভাবে অশৌচ শেষ করে।

সম্পত্তি উত্তরাধিকার—লোধাদের পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে

চাষের জমি, ঘরবাড়ী, গরু বাছুর, ছাগল ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে জামাকাপড়, অলঙ্কার, শিকারের যন্ত্রপাতি। ইহাদের সমাজ পিতৃপ্রধান। সেইজন্য সমস্ত সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। পুত্ররা যদি নাবালক থাকে তাহা হইলে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হয়। পুত্ররা বড় হইলে সম্পত্তি সমগ্র পুত্রদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হইয়া যায়। বিবাহিত কন্যারা পিতার কোন সম্পত্তি পায় না।

গ্রাম সংগঠন—লোধাদের গ্রাম সংগঠন সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করে। মেদিনীপুরের এমন কয়েকটি গ্রাম আছে যেমন শাঁখারীডাঙ্গা, বীরকাঁড়, পাতুলি এবং তালাই যেখানে কেবলমাত্র লোধাদেরই বাস। আবার কিছু গ্রাম আছে যেখানে লোধা এবং অন্যান্য জাতি উপজাতি একই সঙ্গে বাস করে। লোধাদের গ্রামগুলি পঞ্চায়েত বা পরিষদ দ্বারা শাসিত হয়। পঞ্চায়েত দ্বারা বিচারবিভাগীয়, শাসন সংক্রান্ত, জমি সংক্রান্ত বাধা, পারিবারিক, গ্রামীণ কলহ মীমাংসা হয়। কয়েকজন সভ্য দ্বারা পঞ্চায়েত তৈয়ারী হয় এবং তাহারা নির্বাচনের মাধ্যমে আসে। পঞ্চায়েতের মধ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরই স্থান থাকে, মেয়েদের কোন স্থান নাই। শাসকগোষ্ঠির লোকেরা বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। লোধা সমাজের মধ্যে যখন কোন সামাজিক উৎসব পালিত হয় তখন তাহারা সম্মানস্বরূপ একটি 'গাই' অর্থাৎ দশটি পান ও দশটি সুপারি বিশেষ সম্মান হিসাবে পাইয়া থাকে। বিচারের আদালত হিসাবে গ্রাম দেবতার স্থান অথবা মুখিয়ার নিজের বাড়ীতে নির্বাচিত হইয়া থাকে। সাধারণত অপরাধ-মূলক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় অবৈধ সহবাস, স্ত্রী পুরুষ ডাইনী পাওয়া স্ত্রী পুত্রকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি। বিচারের সময় সাক্ষী লওয়া হয় এবং শপথ (Oath) গ্রহণ করিতে হয়। অপরাধ প্রমাণ হইলে দোষী ব্যক্তির শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি নির্ভর করে অপরাধের ধরন এবং তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। নগদ টাকা জরিমানা, গ্রামে ভোজ দেওয়া অথবা দৈহিক ক্ষতির দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। যখন বিচার সভা বসে তখন পঞ্চায়েতের সকল সভ্যকে উপস্থিত থাকিতে হয় এবং মুখিয়া সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চায়েত তৈয়ারী হয় তিনজন কার্যনির্বাহক (office-bearers) কমিটি দ্বারা, তাহারা হইতেছে

(১) মুখিয়া—গ্রামের প্রধান

(২) ডাকুয়া—বার্তাবাহক অথবা ইহাকে কোটাল বলে কারণ ডাকুয়া অধিকাংশ সময় কোটাল গোত্র হইতে আসে।

(৩) পরামাণিক—গ্রামের রাঁধুনী অর্থাৎ গ্রাম্য উৎসবে বা ভোজনে রন্ধনের কাজ করে।

গ্রাম্য বা ব্যক্তি বিশেষে কেহ অপরাধ করিলে অপরাধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুখিয়ার নিকট নালিশ জানায়। মুখিয়া তখন ডাকুয়ার দ্বারা গ্রামের বয়স্কদের জানায় ও বিচারের দিন, সময় স্থির করিয়া দেয়। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এবং বিশেষ স্থানে পঞ্চায়েত সভা বসে ও বিচার হয়। বিচারের সময় বাদী ও বিবাদী উভয়েই উপস্থিত থাকে উভয়েই তাহাদের বক্তব্য উত্থাপন করে এবং সকলের মতামত লইয়া মুখিয়া তাহার সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

ধর্ম বিশ্বাস—লোধারা নানা দেবদেবী, ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। তাঁহাদের বিশ্বাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস যাহা তাহাদের নিকট সচরাচর দৃশ্য নয় কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহারা বুঝিতে পারে ও দেখিতে পায়। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি যাহা মানব আকৃতি এবং যাহাদের দ্বারা মনের আবেগ ও ইচ্ছা পুরণ হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল ব্যক্তিকে শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

ভগবান—যিনি দেবতার শ্রেষ্ঠ, লোধাদের বিশ্বাস তিনি অদৃশ্য পৃথিবীতে অবস্থান করেন। এই বিশ্বাস এবং ধারণা তাহারা প্রতিবেশী হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আরও ধারণা ভগবানের কৃপায় একজন নীচও উচ্চ হইয়া যাইতে পারে। ভগবানের উদ্দেশ্যে কোনদিন প্রাণী বলিদান দেয় না।

বসুমাতা—অর্থাৎ ধরিত্রী মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কেবলমাত্র প্রার্থনা করে। বিবাহ উৎসবে যখন পাত্রহরিদ্রা অনুষ্ঠান হয় তখন তাঁহার প্রার্থনা করে। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেবলমাত্র ফুল, ফলমূল দেয়।

ধরম দেবতা—যিনি সত্যপথের দেবতা। যাঁহার আলাদাভাবে কোন পুজা বা উৎসর্গ হয় না, যে কোন অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রার্থনা করে। তাঁকে

স্মরণ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা অন্য কোন দেবতার পূজার প্রারম্ভে। লোধারা নৃত্য-গীত এর পূর্বে অথবা উৎসব অনুষ্ঠানের পূর্বে বসুমাতা ও ধরম দেবতাকে স্মরণ করে, বিশেষ করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে।

শীতলা মাতা—লোধাদের একটি প্রধান দেবতা। ভয় এবং ভীতিতে তাঁহার পূজা করে। কারণ তিনিই সংক্রামক ব্যাধি কলেরা, বসন্ত প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বৎসরে দু-তিনবার পূজা দেয় এবং পূজা, উৎসর্গ এবং অন্যান্য উপহার দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন। তাঁর উদ্দেশ্যে আতপ চাল, মিষ্টান্ন, নানাবিধ ফল, ডাব, দুধ, পান, ছাগল বলি দেয়।

চণ্ডী—লোধাদের শক্তিশালী দেবতা চণ্ডী অর্থাৎ রুদ্র দেবতা। চণ্ডী নানা নামে পরিচিত। যেমন জয়চণ্ডী, বড়াম চণ্ডী, ভৈরবী চণ্ডী প্রভৃতি। তাহাদের ধারণা চণ্ডী হইতেছেন মধ্যবয়স্ক নারী, লালপাড় শাড়ী এবং নানা অলঙ্কার পরিধান করেন, তাঁহার তিনটি চক্ষু। রাত্রিতে ঐ চক্ষু জলজল করিয়া জলে। তিনি বন্য জন্তু ও বিষধর সর্পের নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণত গাছতলায় তাঁর অধিষ্ঠান। সেইজন্য মাটির 'ঘোড়া', তাঁহার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। বৎসরে তিন চারবার তাঁহার পূজা দেয়। পূজায় চাল, ফলমূল, কাপড়, সিন্দুর, তেল, মিষ্টি উপহার দেয় এবং ছাগল ও মুরগী উৎসর্গ করা হয়।

বড়াম বা গড়াম হইতেছে লোধাদের রক্ষণাবেক্ষণের দেবতা। লোধাদের বিশ্বাস বড়াম শক্তিশালী বনদেবতা। জঙ্গলেই তাঁহার অধিষ্ঠান, তাহাদের ধারণা বড়াম মানুষের মত লম্বা, সারাদেহ লোমে আবৃত, বড় বড় চক্ষু, হাতে কুঠার, হস্তী বা বাঘের উপর আসন। লোধাদের ধারণা বড়াম দেবতা রাগান্বিত হইলে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করিয়া দেবেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য চৈত্র সংক্রান্তি এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন, মাটির ঘোড়া বা হাতী ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনেক সময় মাটির হাতীকে বড়ামের প্রতিকৃতি হিসাবে পূজা দেয়। বড়াম পূজার জন্য দেহেরী আছে। তাহাছাড়া দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেয়। অনেক সময় পাথরে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া গাছতলায় বড়ামের প্রতিকৃতি স্থাপন করে। দেবদেবীর পূজার জন্য প্রত্যেক গ্রামে পূজার কার্যনির্বাহক সমিতি থাকে: (১) দেহেরী অর্থাৎ পূজারী (২) টলিয়া অর্থাৎ সহকারী পূজারী (৩) হস্তকার অর্থাৎ প্রাণী বলিদানকারী।

লোধারা নানা ভূত প্রেতে বিশ্বাসী। তাহাদের ধারণা ভূত সর্বত্র রহিয়াছে, তাহাদের ক্ষতি করিবে। যুগিনী হইতেছে প্রধান ভূত। যে সকল মানুষ সংক্রামক ব্যাধিতে অথবা অপঘাতে মারা যায় তাহারাই যুগিনী ভূতে পরিণত হয়। ইহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা দেয় এবং গ্রাম হইতে বহুদূরে মাঠে রাস্তার ধারে পূজা করে। ইহার উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেয়। অন্যান্য ভূতের মধ্যে কুন্দরা, প্রেতসিনি, কালপুরুষ, গোমুয়া হইল প্রধান। তাহাছাড়া লোধারা নানাপ্রকার তুক-তাক, যাদুমন্ত্র ব্যবহার করে, যেমন, তেলপড়া, জলপড়া, সিন্দুরপড়া, ভূতছাড়ান, বাণমারা ইত্যাদি। এই সকল ব্যবহার করার জন্য ওঝা বা গুণিন্ নিযুক্ত আছে। গুণিন্‌রা মন্ত্র দ্বারা অতিপ্রাকৃত শক্তি ভূতকে আয়ত্তে রাখে এবং ওঝা মন্ত্র, গাছগাছড়া প্রয়োগ করিয়া নানা অসুখ সারাইয়া তুলে।

লোধারা নানা উৎসব পালন করে। টুসু পৌষ-সংক্রান্তির দিন উদ্‌যাপিত হয়। টুসুকে লইয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নাচ ও গানে নিজদিগকে মাতাইয়া রাখে। গো-বন্দনা ইহাদের আর একটি উৎসব। বন্দনার সব গানই গো-কেন্দ্রিক।

লোধা কল্যাণ—লোধাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার কল্যাণমূলক কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই রকম কয়েকটি প্রকল্প মেদিনীপুর জেলায় লওয়া হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় ঢোলকাট, ডহরপুর, কুকাই, আউলি গেড়িয়া ও ধানশোলায়, বহু লোধা এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত। প্রত্যেক পরিবারকে স্থায়ীভাবে বসতির জন্য ঘর তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমবেশী দু-একর করিয়া জমি, বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ, ছাগল মুরগী সরবরাহ করা হইয়াছে। আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, আশ্রম, ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস। কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, মাদুর বুননের কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় এবং বৃহত্তর সমাজের সহিত এক হইয়া যাইতে পারে ইহাই লক্ষ্য।

পশুপালক গোষ্ঠী

টোডা (The Toda)

ভারতের একমাত্র পশুপালক গোষ্ঠী বহু-পতিমূলক সমাজ বিশিষ্ট সম্প্রদায় সমাজবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করিয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথমে বহু নৃ-বিজ্ঞানী ইহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মিশিয়াছেন, সমীক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন মার্শাল, থার্সটন, রিভার্স। ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি সমীক্ষা দলও টোডাদের উপর বিশেষ সমীক্ষা করেন।

বাসস্থান—দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে টোডা উপজাতির বাস। পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মিলনে এই উপত্যকা। এই উপত্যকা ৭৬°২৭' থেকে ৭৭°৪১' দ্রাঘিমা রেখা এবং ১১°৮' থেকে ১১°৮' অক্ষ রেখার মধ্যে অবস্থিত। এই উপত্যকা প্রায় ৪৭৮ বর্গমাইল জুড়িয়া অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, তাপমাত্রা ৪'৪° সে. গ্রে. হইতে ২৩'৯ সে. গ্রে.। গড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯২'০৯ সে. মি.। গ্রীষ্মের প্রখরতা বা শীতের কাঠিন্য কোনটাই প্রকট নয়।

নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চল বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ আর তারই সঙ্গে আছে বন্য প্রাণী। নানাবিধ বনজ উদ্ভিদের মধ্যে ওক, দেবদারু, ইউক্যালিপ্টাস, লোহা কাঠ হইল প্রধান। বন্যপ্রাণীর মধ্যে হাতী, সম্বর, নানাধরনের হরিণ, এ্যান্টিলোপ বাইসন, শূকর, নীলগাই, বন্যকুকুর হইল প্রধান।

টোডারা সংখ্যায় প্রায় ৭৬৮ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় দেড়শতজন খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠী হইতে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত ইহাদের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা কোথা হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছে তাহার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। উচ্চতায় মাঝামাঝির উপরে, পুরুষদের উচ্চতা ১৬৯'৮ সে. মি. এবং স্ত্রীলোকেদের উচ্চতা ১৫২'৫ সে. মি.। ইহাদের চুলের গঠন ঢেউ খেলানো, চুলের রং কালো, চুলের পুরুত্ব মিহি থেকে মোটা। গায়ের রং হাল্কা বাদামী অর্থাৎ খুবই ফর্সা। মাথার গঠন

লম্বা ও সরু, মাথার সূচক ৭৩'৭৪। নাকের গঠন সমুন্নত, নাকের সূচক ৭৫ অর্থাৎ সরু নাক। হ্যাডন মনে করেন আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ভারতের নামবুদ্রি ব্রাহ্মণদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। অনেকে জাপানের আইনু জাতির সহিত ইহাদের সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ভাষা—টোডারা যে ভাষায় কথা বলে তাহার অনেকখানি তামিল ভাষার সহিত মিল আছে। ইহার কোন লিখিত অক্ষর নাই।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি :—

পেশা—টোডারা কৃষিকার্যও জানে না অথবা শিকারও তাহাদের নিকট অজানা। কেবলমাত্র গৃহপালিত মহিষ হইতে তাহাদের জীবনযাত্রার সমূহ প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। সুতরাং মহিষ রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণে তাহাদের সমস্ত শ্রম লাগাইতে হয়। পুরুষেরা প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করিয়া থাকে যেমন চারণভূমিতে মহিষ চরান, দুগ্ধদোহন, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, জ্বালানিকাষ্ঠ সংগ্রহ, ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা এবং আমদানী ও রপ্তানী করা। মেয়েরা পানীয় জল সংগ্রহ করে, খাদ্যবস্তু গুঁড়া করা এবং গৃহস্থালীর কাজ করিয়া থাকে। মেয়েদের মহিষ সংক্রান্ত কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ইহা তাহাদের নিকট ধর্মীয় নিষেধ।

পুরুষেরা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই জন্তুগুলিকে বিভিন্ন চারণভূমিতে লইয়া যায়। প্রতিদিন দুইবার করিয়া দুধ-দোহন করে—একবার ভোরের দিকে অন্য একবার বিকালের দিকে। মহিষের দুধ হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী হয়। বিশেষ করিয়া ননী, মাখন, ঘি ইত্যাদি। মাটির ভাঁড়ে দুধ রাখিয়া তাহাতে বাঁশের মন্থনদণ্ড ঘুরাইয়া মাখন তৈয়ারী করে। সেই মাখন হইতে পুনরায় ঘি তৈয়ারী করে। এইভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য নিজেরা ব্যবহার করে অথবা বাহিরের প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিনিময় করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক—টোডাদের সহিত নীলগিরি পাহাড়ের আরও কয়েকটি উপজাতির খাদ্য বিনিময় ঘটিয়া থাকে। ফলে তাহাদের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। বাদাগা, কোটা, কুরুম্বা, ইরুলা উপজাতি হইল টোডাদের প্রতিবেশী গোষ্ঠী। বাদাগারা কৃষিজীবী গোষ্ঠী। ইহাদের নিকট হইতে দুগ্ধজাত খাদ্যের বিনিময়ে কৃষিজাত খাদ্য-

বস্তু সংগ্রহ করে। কোটারা নানা তৈজসপত্র যেমন—মাটির পাত্র এবং লোহার জিনিসপত্র তৈয়ারী করে। সুতরাং টোডারা দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিনিময়ে ঐ সকল তৈজসপত্র সংগ্রহ করে। কুরুম্বা এবং ইরুলারা টোডাদের সহিত বনজ সম্পদ বিনিময় করিয়া থাকে।

পশুপালন—টোডাদের একমাত্র গৃহপালিত পশু মহিষ। প্রত্যেক পরিবারের দশ-বারোটি করিয়া মহিষ থাকে। ইহারা গাভীও পালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের স্ত্রী নামে সম্বোধন করিয়া থাকে। মহিষগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করে। কয়েকটি সাধারণ মহিষ ও কয়েকটি পবিত্র মহিষ। সাধারণ মহিষগুলিকে যে কোন টোডা ব্যক্তি চারণভূমিতে লইয়া যায় এবং দুগ্ধ দোহন করে; কিন্তু পবিত্র মহিষগুলির জন্য নির্দিষ্ট লোক নিয়োজিত থাকে এবং পবিত্র স্থানে দুগ্ধ দোহন করে। মহিষের পুরুষ বংসগুলি কয়েকটি দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

খাদ্য—টোডারা নিরামিষাশী। ইহাদের প্রধান খাদ্য চাউলকে দুধে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া। ইহাকে জাগারী বলে। তাহাছাড়া তাহারা কৃষিজাত শাক-সব্জী বা তরকারী আনিয়া রান্না করিয়া খায়। বর্তমানে ইহারা রুটী এবং ডাল খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা নিকটবর্তী বাজার হইতে সংগ্রহ করে। তাহাছাড়া পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই মদ্যপানে আসক্ত এবং পুরুষ, স্ত্রী তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করিতেও পটু।

আগুনের ব্যবহার—কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালান ইহাদের চিরাচরিত প্রথা। বর্তমানে দেশলাই এবং লাইটারের ব্যবহার শিখিয়াছে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—পাহাড়ের উপত্যকায় টোডাদের গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়াইয়া আছে। এক একটি গ্রামে ৮।১০টি বাড়ী। পাহাড়ের ঢালে ঢালে গ্রামগুলি অবস্থিত, আর গাছপালা দিয়া ঘেরা। টোডাদের ঘরগুলির ধরন দুই রকমের। এক রকমের লম্বা ঘর দেখিতে অর্ধ চোঙাকৃতি। চাল ও দেওয়াল পৃথক করা যায় না। ১৫'×১২' স্থান লইয়া ঘরটি তৈয়ারী। বাঁশের ছিলাকে বাঁকাইয়া দুই প্রান্ত মাটির কাছাকাছি খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। এইভাবে লম্বাকৃতিভাবে বাঁশ এবং কাঠের দ্বারা কাঠামো তৈয়ারী করে। পিছনের দিকের দেওয়াল কাঠের পাটাতনের দ্বারা শক্ত ভাবে তৈয়ারী করে। সামনের দিকে প্রবেশপথের জন্য একটি দরজা রাখে। তারপর লম্বা লম্বা শুকনা ঘাস অথবা লতাপাতার দ্বারা

ছাউনি হয়। ঘরটির দুইটি প্রকোষ্ঠ। মাঝে কাঠের বেড়ার দ্বারা বিভক্ত করা থাকে। সামনের দিকের প্রকোষ্ঠ শয়ন ও বসার ঘর এবং পিছনের দিকের প্রকোষ্ঠটিতে তাহারা দুধের কাজ করিয়া থাকে। ঘরের কোন জানালা নাই বলিয়া অন্ধকার। শয়ন কামরার মধ্যে উঁচু লম্বাকৃতি মাটির ঢিবির সমতলক্ষেত্র করা থাকে। ইহা শয়ন করিবার জন্য ব্যবহার করে। যে প্রকোষ্ঠটিতে দুধের কাজ করা হয় তাহাতে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করে না। টোডাদের আর এক ধরনের গোল পত্তনীর ঘর থাকে। তাহার উপরের আবরণও গোলাকার। এই সকল ঘরগুলি পাথরের বেড়া দেওয়া থাকে এবং একটিমাত্র প্রবেশ পথ থাকে। এই ঘরগুলিতে মহিষ থাকে।

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র—গৃহস্থালীর আসবাবপত্র বলিতে তেমন কিছুই নাই। দুধদোহনের জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করে এবং মাটির হাঁড়িতে দই, ঘোল পাতিয়া রাখে। রান্না করার জন্য মাটির পাত্র রহিয়াছে। মাটির পাত্রতেই খাদ্যবস্তু সঞ্চিত রাখে। বর্তমানে এ্যালুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। দুধ দোহনের জন্য বালতি ব্যবহার করে এবং মাখন তৈয়ারীর জন্য মন্থন দণ্ড ব্যবহার করে। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করার জন্য দা, কুড়াল ব্যবহার করে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—টোডা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করে। সাদা মোটা লম্বা কাপড় কোমরে জড়াইয়া, কাপড়ের অপর প্রান্ত কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া রাখে। নীল, কাল ডোরাযুক্ত সাদা কাপড় বহির্বাস হিসাবে পরিধান করে। পুরুষেরা কোমরে একটি বেল্ট পরিধান করে। পুরুষেরা সার্ট এবং মেয়েরা ব্লাউজ পরিধান করে। চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য টোডা মেয়েরা খুব বেশী আগ্রহী। লম্বা চুলকে আঁচড়াইয়া মাথার দুইপাশে বিভক্ত করিয়া চুলকে কুণ্ডলী আকারে পাকাইয়া কাঁধের দুই প্রান্ত দিয়া বিনুনীর মত ঝুলাইয়া রাখে। পুরুষেরা লম্বা চুল পিছনের দিকে আঁচড়াইয়া রাখে। ছোট ছেলে-মেয়েরা মাঝারি করিয়া চুল কাটে. টোডা মেয়েরা অলঙ্কার পরিতে খুবই পছন্দ করে। তামা, রূপার নানাবিধ গহনা বিশেষ করিয়া কানবালা, নোলক, হার পরিধান করে। ছেলেরাও আংটি ও কানে বালা পরিতে ভালবাসে।

টোডা মেয়েরা উল্কি কাটিয়া দেহকে সাজাইয়া তুলিতে বিশেষ পছন্দ

করে। চিবুকে, নীচের ঠোঁটে, উপরের বাজুতে, বুকে, গলায় উল্কি কাটিয়া নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পুরুষেরা বাম বাহুতে তপ্ত লাল লোহার দ্বারা কালো দাগ কাটে। এইভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই নিজেদের সজ্জিত করে। ইহারা সপ্তাহে দু-একবার স্নান করে এবং মাথায় ও শরীরে ঘি মাখাইয়া শরীরকে নরম ও চক্‌চকে করিয়া তুলে।

সামাজিক গঠন—টোডাদের প্রতিবেশী উপজাতি রূপে বাস করে বাদাগা, কোটা, ইরুলা ও কুরুম্বা। ইহাদের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্কই বেশী। কিন্তু কোটাদের সহিত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক সম্পর্কও দেখা যায়। কোটারা, টোডাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং ইহার বিনিময়ে উৎসর্গকৃত মহিষের মাংস গ্রহণ করে। তাহাছাড়া গ্রাম পরিচালনায় টোডাদের সহিত বাদাগাদের সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। টোডাদের গ্রামপরিষদের পাঁচজন কার্যনির্বাহক সভ্যের মধ্যে বাদাগাদের মধ্য হইতে একজন নির্বাচিত হয়। সুতরাং টোডাদের সহিত অন্যান্য প্রতিবেশীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে।

দ্বৈতদল—সমগ্র টোডা উপজাতিটি দুইটি দ্বৈতদলে (Moiety) বিভক্ত। ইহারা যথাক্রমে টারথারল (Tartharol) এবং টিভালিয়ল (Teivaliol)। এই দ্বৈতদল দুইটির মধ্যে একটি অপরটির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না অর্থাৎ ইহারা অন্তঃবিবাহমূলক (Endogamous)। অনেকটা হিন্দুদের বর্ণ প্রথার মত। উভয় দলের মধ্যে ভাষায় এবং অনুষ্ঠানের কিছু তারতম্য দেখা যায়। টারথারল দলের অধীনে পবিত্র মহিষ থাকে এবং টিভালীয়ল দল হইতে পশুপালক এবং পশু-পরিচর্যাকারক স্থির হয়। প্রত্যেকটি দ্বৈতদল বহিঃবিবাহমূলক গোত্রে বিভক্ত। টারথারল দলটি বড় এবং বারটি গোত্রে বিভক্ত ও টিভালীয়ল দলটি ছয়টি গোত্রে বিভক্ত। টারথারল দলটি টিভালীয়ল থেকে মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া দাবী রাখে। প্রত্যেকটি গোত্রের অধীনে অনেকগুলি করিয়া গ্রাম থাকে এবং গ্রামগুলির নাম গ্রাম প্রধানের নামানুসারে হইয়া থাকে। সুতরাং গোত্রগুলির নাম গোত্র-দেবতার তুলনায় অঞ্চলভিত্তিক হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি গোত্র দুইটি উপ-গোত্রে বিভক্ত। ইহাদের 'কুদ্রু' বলে। কুদ্রুগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাজ করে। গোত্রগুলির আর একটি বিভাগ আছে তাহাকে বলে 'পোম'। পোমের কাজ হইতেছে অনুষ্ঠানের খরচ নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং টোডাদের গোত্রগুলি

সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকারিতা উভয়ই বহন করে। গোত্রগুলির নিজস্ব চারণভূমি এবং দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং পবিত্র মহিষ থাকে।

পরিবার—টোডাদের ক্ষুদ্রতম সংস্থা পরিবার। গোত্রগুলি পরিবারে বিভক্ত। ইহাদের পরিবার পিতৃকেন্দ্রিক অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করে। টোডা পরিবার বহুপতিমূলক অর্থাৎ পরিবারগুলি তৈয়ারী হয় কয়েকজন ভাই অথবা কয়েকজন ব্যক্তি ও তাহাদের সাধারণ একজন স্ত্রী এবং তাহাদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা। বর্তমানে যৌথ পরিবারও দেখা যায় কয়েকজন স্বামী ও কয়েকজন স্ত্রী এবং তাহাদের অবিবাহিত পুত্রকন্যাদের লইয়া গঠিত। পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকেদের স্থান খুবই নিম্নে। স্ত্রীরা কোন প্রয়োজনীয় কাজ বা আনুষ্ঠানিক কাজে জড়িত থাকে না। পুরুষেরাই কেবলমাত্র পরিবারের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকে না, তাহারা মহিষকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কাজ সমাধা করিয়া থাকে। তাহাছাডা ঘর তৈয়ারী, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং রান্নার কাজ করিয়া থাকে। মেয়েরা কেবলমাত্র ঘর পরিষ্কার করা, বাসনমাজা, পানীয় জল সংগ্রহ, সেলাই-এর কাজ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকে। যদিও স্ত্রীদের স্থান নিম্নে তথাপি তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে না। টোডাদের মধ্যে শ্রেণীগত সম্বন্ধ দেখা যায়। একই সম্বোধন দ্বারা অনেককেই সূচিত করে। 'পিতা' শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র পিতাকে বুঝায় না ইহার দ্বারা কাকা এবং তাহাদের সমবয়সী লোককে বুঝায়। 'ম' সম্বোধন দ্বারা কেবলমাত্র মাকে বুঝায় না ইহার দ্বারা মায়ের বোন এবং তাহাদের সমবয়সী স্ত্রীদের বুঝায়। 'মুন' (mun) শব্দ দ্বারা মায়ের ভাই এবং পিতার বোনের স্বামীকে বুঝায়।

জন্ম—স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে এবং নানা অনুষ্ঠান পালন করে। যখন পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন ঐ স্ত্রীকে গ্রাম থেকে কিছু দূরে ঘর তৈয়ারী করিয়া রাখে। সেখানে সে প্রায় একমাস অতিবাহিত করে। শিশুর জন্ম হওয়ার পর ধাত্রীমাতা ছুরিকা দ্বারা নাভিচ্ছেদন করে এবং ইহা মাটিতে পুঁতিয়া দেয়।

শিশুর জন্ম হওয়ার পর শিশু পিতার নামে পরিচিত হয় এবং পিতার গোত্র পাইয়া থাকে। একজন স্ত্রীর অনেকজন স্বামী থাকায় তাহারা

সামাজিক পিতা নিরূপণ করে। স্বামীদের মধ্যে যিনি শিশুর পিতা হইতে ইচ্ছুক তিনি, স্ত্রী যখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা সেই সময় একটি উৎসব পালন করেন এবং অন্যান্য স্বামীরা উৎসবে উপস্থিত থাকেন। এই উৎসবকে বলে 'পুরুস্থৎপমী' উৎসব বা 'তীরধনুক' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান জঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানের সময় একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে এবং সেই রাত্রিতে জঙ্গলে অতিবাহিত করে। সেই দিন হইতে 'ইচ্ছুক পিতা' সামাজিক পিতা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে এবং শিশুর জন্ম হইবার পর তিনি পিতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

নামকরণ উৎসব—শিশুর জন্ম হইবার তিনমাস পর্যন্ত শিশুর মুখ কাপড় দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে কু-দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য। তারপর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুর মুখ উন্মোচন করা হয়। কিছুদিন পর শিশুর নামকরণ করা হয়, কোন দেবতার নামে অথবা পাহাড়ের নামে। তাহার একটি ডাক নামও থাকে। ইহা বাদাগার দ্বারা নামঙ্কিত করা হয়।

বিবাহ—বহু-পতি বিবাহ টোডা সমাজে প্রচলিত নিয়ম। যদিও এক বিবাহ ও বহু-পত্নীমূলক বিবাহ পাওয়া যায় না এমন নয়। বহু-পতিমূলক বিবাহের কারণ হইতেছে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার তারতম্য। টোডাদের মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ টোডারা শিশুহত্যা বিশেষ করিয়া কন্যা হত্যা (Female infanticide)-কে এক সামাজিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে। বর্তমানে সরকার আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে, স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহারা চিরাচরিত বিবাহ প্রথা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ফলে অনেকগুলি পুরুষ একই সঙ্গে অনেকগুলি স্ত্রীকে বিবাহ করিতেছে। ইহার ফলস্বরূপ যৌথবিবাহ দেখা যায়।

যদি প্রথমে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে তাহা হইলে কনিষ্ঠরা সকলে স্বামী বলিয়া গণ্য হয়, এমনকি স্বামীর বিবাহের পর পুনরায় যদি তাহার ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সেও স্বামী বলিয়া গণ্য হয়। বহু স্বামী বলিয়া স্ত্রী পালা করিয়া কয়েকদিন এক এক স্বামীর সহিত অতিবাহিত করে। স্বামীরা পরস্পর ভাই (fraternal) হইতে পারে অথবা স্বামীরা সমাজে যে কোন ব্যক্তি (non-fraternal) হইতে পারে।

অতি শৈশবে বিবাহ টোডা সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। মেয়ে যখন চা'র কিংবা পাঁচ বৎসরের হয় তখন বরের পিতা কন্যাটি পছন্দ করিয়া আসে। ঐ সময় কন্যাকে নূতন বস্ত্রখণ্ড উপহার দিয়া বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া রাখে। যতদিন পর্যন্ত কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সে তাহার পিত্রালয়ে থাকে। কন্যা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ পনেরো ষোল বৎসরের হয় তখন আবার বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। পাত্র, কন্যার পিতাকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করে এবং কন্যা স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করিবার জন্য আসে।

টোডাদের সমাজের মধ্যে মাতুলকন্যা (M. B. D.) অথবা পিতৃস্বসা-কন্যা (F. S. D.) বাঞ্ছনীয় বিবাহরূপে অনুমোদিত, কারণ তাহাদের স্বামী স্ত্রী পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে।

স্ত্রী বন্ধ্যা, অলস অথবা কলহপ্রিয়া হইলে স্বামীরা তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্তা স্ত্রী স্বামীদের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিলে তাহারা তাহাকে একটি মহিষ দেয়। আবার কোন স্ত্রী মারা গেলে স্বামীরা বিপত্নীক হইয়া যায়। তখন তাহারা সুবিধামত অন্য একজনের পরিবারে স্বামী হইতে পারে। ইহার ফলে বিপত্নীক ব্যক্তিকে মহিষ বা অর্থ সম্পত্তি দিতে হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে বিবাহ করিতে পারে। ফলে নূতন স্বামীকে স্ত্রীর পূর্বেকার ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণের জন্য মহিষ দিতে হয়।

অবৈধ সহবাস টোডা সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। টোডা স্ত্রীদের বিবাহের পূর্বে বা পরে যৌন সঙ্গমে কোন বাধা থাকে না। বিবাহের পরেও তাহারা স্বামী ছাড়াও অন্য কোন পুরুষের সহিত বা পবিত্র পশু-পালকের সহিত অবাধভাবে যৌন সঙ্গম করিয়া থাকে।

মৃত্যু—মৃতদেহকে সংকারের জন্য দুইবার অনুষ্ঠান পালন করে। মৃতের সংকার করিবার জন্য তাহারা মৃতদেহকে শ্মশানভূমিতে লইয়া যায়। মৃতের উপর নূতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া থাকে। মৃতের সহিত তাহার ব্যবহৃত বস্ত্র, গহনা এবং খাদ্য দিয়া থাকে। দাহ করিবার সময় অবশ্য মূল্যবান জিনিসপত্র সরাইয়া লয়। দাহ করিবার পূর্বে দুইটি মহিষকে বলি দেওয়ার রীতি টোডা সমাজে প্রচলিত। তাহাদের বিশ্বাস এই মহিষ দুইটি আত্মাটিকে নানাভাবে সেবা করিবে। চিতা প্রজ্জলিত করিবার পূর্বে তাহাতে অনেক সময় ঘি ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তির মাথা

হইতে চুলের গোছা কাটিয়া রাখা হয়। প্রথমবার সৎকারের পর কয়েক মাস পরে দ্বিতীয়বার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুনরায় চিতাতে চুলের গোছা ও পোড়া হাড়ের অংশ ঘি মাখাইয়া সাজান হয় এবং দাহ করা হয়। দাহস্থানে একটি পাথরের খণ্ডকে চিতাভস্ম মাখাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখে। দাহ শেষ করিয়া ফিরিবার সময় ছাইকে পাথরের চাঙ চাপা দিয়া আসে। মৃতব্যক্তির নিকট সম্বন্ধীয় যেমন অবিবাহিত পুত্র কন্যা ভাই স্ত্রী অথবা স্বামী অশৌচ পালন করে। নিকটস্থ পূর্ণিমাতে অশৌচ শেষ হয়। অশৌচ-এর শেষে ভোজনে মিলিত হয়। টোডাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয়বার সৎকারের পর আত্মা স্বর্গে যায় ও সেখানে ইহলোকের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার—টোডাদের সকল সম্পত্তি ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা কুলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার। পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে ঘরবাড়ী, গৃহস্থালীর বাসনপত্র এবং সাধারণ মহিষ। গোত্রের সম্পত্তি চারণভূমি, পবিত্র মহিষ, মহিষের খাটাল প্রভৃতি।

টোডাদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ। সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রের মধ্যে হস্তান্তরিত হয় পিতার মৃত্যুর পর প্রকৃত পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি স্থানান্তরিত হয়। যদি মৃত ব্যক্তির ভ্রাতারা জীবিত থাকে অথবা অন্য পিতারা জীবিত থাকে তাহা হইলে সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার পিতার মৃত্যুর পর যদি সকল পুত্ররা একান্নবর্তী থাকে তাহা হইলে সম্পত্তি যৌথ হিসাবে থাকিয়া যায়। সকলে পৃথকভাবে পরিবার তৈয়ারী করিলে সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ হয় কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র একটি করিয়া বেশী মহিষ পাইয়া থাকে। মেয়েরা সম্পত্তির কোন অংশ পায় না।

গ্রাম সংগঠন—টোডারা গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের এক পঞ্চায়েত গঠন করে। ইহাকে 'নায়েম' (Naim) বলে। নায়েম পাঁচজন কার্যনির্বাহক সদস্য লইয়া তৈয়ারী। টারথারল দৈবতদল হইতে তিনজন, টিভেলিয়ল হইতে একজন এবং বাদাগা উপজাতি হইতে একজন নির্বাচিত হয়। এই ধরনের পঞ্চায়েত প্রায় দেখা যায় না। ব্যক্তি-পঞ্চায়েতটি পারিবারিক এবং গোত্র অনুযায়ী বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে। বিশেষ করিয়া

যখন কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান পালিত হয় তখন নায়েম পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। পঞ্চায়েত ছাড়াও কুলবৃদ্ধরা উৎসব অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্য করে। অনুষ্ঠানের খরচ কুলবৃদ্ধরা সংগ্রহ করিয়া থাকে। টোডা সমাজে পঞ্চায়েত একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ধর্ম বিশ্বাস—টোডারা নানা দেব-দেবী ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। তাহারা মনে করে মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা 'অমনদর' জগতে অর্থাৎ আত্মার জগতে চলিয়া যায় এবং সেখানে পৃথিবীর মত মহিষ লইয়া জীবন যাপন করে। তাহাদের বিশ্বাস প্রায় আঠারশত দেব-দেবী তাহাদের মধ্যে আছেন। ইহাদের প্রধান দুইটি 'ওন' এবং 'টিয়েকজ্রী'। ওন হইতেছেন পুরুষ দেবতা এবং সৃষ্টিকর্তা টিয়েকজ্রী, ওন এর ভগিনী এবং টোডাদের প্রকৃতি, আচার-আচরণ সৃষ্টিকর্তা। ইহাছাড়া নদী দেবতা, পর্বত দেবতা প্রভৃতি দেবতা আছেন। টোডারা রোগ ব্যাধি, মৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যু, মহিষের দুগ্ধ শূন্যতা প্রভৃতিকে দুষ্টভূতের কাজ বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গুণিন ডাকায় এবং নানা ক্রিয়াকাণ্ড বা তুক্-তাক্ করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপজাতি

টোটো (The Toto)

টোটোরা পশ্চিমবঙ্গের একটি তপশীলী উপজাতিরূপে পরিগণিত। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে টোটো সম্প্রদায়ই সবথেকে সংখ্যা-লঘু। ইহাদের জনসংখ্যা প্রায় ছয় শতের মত। ১৯০১ সালের লোক-গণনা অনুযায়ী ইহাদের সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। প্রথমে ১৮৯৫ সালে ডি. সান্দারের একটি সমীক্ষা বাহির হয়। তাহাতে টোটোদের উল্লেখ ছিল। ইহার পর ১৯১৯ সালে মিলিগানের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা বাহির হয়। ১৯৫৫, ১৯৬৮ সালে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের টোটো সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বাহির হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর টোটোদের সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থানার অধীনে টোটোপাড়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। উত্তরের ভুটানের সুউচ্চ পাহাড়-শ্রেণী আর পূর্বদিকে ঘিরিয়া আছে তোর্সা নদী। দক্ষিণ-পশ্চিমে 'হাউরি' নদী, টিটি নামক বিখ্যাত অরণ্য থেকে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, টোটো পাড়ার দক্ষিণে পাঁচ মাইল দূরে নিকটতম গ্রাম বল্লালগুড়ি এবং সাত মাইল দূরে লঙ্কাপাড়া বাজার। এখান থেকে টোটোপাড়ার সহিত কয়েকটি পাহাড়ী পথ পার হইয়া সংযোগ রক্ষা করা যায়। এই ছোট্ট গ্রামটিতে টোটোরা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

গ্রামটি পাহাড়ী অরণ্যভূমিতে অবস্থিত। শাল, পিপুল, শিরীষ, শিমু, সিরি প্রভৃতির বনভূমি। তাহাছাড়া আছে বাঁশের ঝোপঝাড়, আর আছে লেবু, আম, কাঁঠাল প্রভৃতির ফলের বাগান। এই অরণ্যভূমিতে নানারকম জীবজন্তু যেমন বন্যহাতী, বানর, বাঘ, হরিণ, বন্য শূকর, গণ্ডার, খরগোস, নানারকমের পাখী প্রভৃতির আবাস। তাহাছাড়া দেখা যায় গৃহ-পালিত পশু গরু, ছাগল, শূকর, কুকুর, মুরগী ইত্যাদি।

টোটোরা সংখ্যায় প্রায় ছয়শত এবং মঙ্গোলীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের উচ্চতা মাঝামাঝি, গায়ের রং বাদামী হইতে হলদে, মাথার চুল

সোজা, গোঁফ দাড়ি অত্যল্প, কপাল মাঝারি, চক্ষু ছোট, মঙ্গোলীয় ভাঁজ বর্তমান। নাক চ্যাপ্টা, হনুঅস্থি চওড়া স্পষ্ট বোঝা যায়। মুখমণ্ডল গোলাকৃতি।

ভাষা—টোটোদের ভাষা তিব্বত-বার্মা ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতী, ভুটিয়া, বোডো, নেপালী এবং বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ টোটো ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টোটোরা সকলেই নেপালী ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারে। কিছু কিছু টোটো বর্তমানে ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষায় কথা বলে।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি :

পেশা—আগে কমলালেবু উৎপাদনই ছিল টোটোদের প্রধান জীবিকা। প্রায় বছর কুড়ি ধরিয়া কমলালেবুর চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদিও টোটো পাড়ায় কমলালেবু কুঞ্জগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে তথাপি টোটোরা ভুটান থেকে কমলালেবু আনিয়া সমতল ভূমির হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছুটা জীবিকার সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। টোটো পাড়ার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মায়। টোটোরা এইগুলি সংগ্রহ করিয়া কিছু নিজেদের কাজে লাগায় আবার সমতল ভূমির অধিবাসীদের বিক্রয় করে। জুলাই-আগস্ট মাসে জংলী বাঁশের অঙ্কুর হইতে ভীষণ উপাদেয় খাদ্য তৈয়ারী করে। আবার অনেক সময় সমতল ভূমির বাজারে বাঁশ বিক্রয় করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, কাপড়চোপড়, লবণ, তেল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনে। কমলালেবু চাষের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু "কাওনি" আর "মারুয়ার" চাষও করিত। এইগুলি স্থানান্তর প্রথায় চাষ করিত। এদিকে কমলালেবুর চাষ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সুযোগে নেপালীদের আগ্রহ দেখা দেয় ঐ সকল জমি আবাদ করিবার জন্য, বর্তমানে নেপালীদের সংস্পর্শে আসার ফলে টোটোরা স্থায়ী কৃষিজীবী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া ফেলে তারপর খণ্ড খণ্ড জমি পাহাড়ের গাত্রে ধাপে ধাপে বাহির করে। বর্তমানে লাঙ্গল দ্বারা জমিকে কর্ষণ করে। প্রথমে একবার লাঙ্গল করার পর মাটি শুকনা হওয়ার জন্য কয়েকদিনের জন্য জমিকে ফেলিয়া রাখে। পরে পুনরায় লাঙ্গল দেওয়ার

পর, জমিকে সমতল করার জন্য মই দেয়। তারপর বীজ ছড়াইয়া দেয়। মার্চমাসে 'কাওনি' অর্থাৎ একধরনের জোয়ার বপন করে এবং জুন মাসে শস্য কাটে। ভুট্টা বীজ মার্চ মাসে বপন করে এবং শস্য পাকে জুলাই অথবা আগস্ট মাসে। 'মারুয়া' বপন করে জুলাই এবং আগস্ট মাসে, শস্য কাটে অক্টোবর মাসে।

বর্তমানে ধান চাষ করিতে শিখিয়াছে। ঠিক্ একপশলা বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে লাঙল দিয়া ধান ছড়াইয়া দেয় এবং হেমন্তে শস্য পাকিলে কাটিয়া লইয়া আসে। কোন কোন জমিতে আখ চাষ করিতেও দেখা যায়। কিছু কিছু শাক্-সব্জীর চাষও হয়। জঙ্গল হইতে ফলমূল আহরণ, কমলালেবু, বাঁশ আর মুরগী বিক্রয় করিয়া যা অর্থ পায় তাহাতে খাদ্যশস্য কিনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। টোটোদের মধ্যে সুপারির চাষ বাড়িয়াছে। অবশ্য বর্তমানে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল চাষ হয় তাহা হইল—

ভুট্টা—জুলাই-সেপ্টেম্বর (স্থায়ী চাষ)
কাওনি—আগস্ট-অক্টোবর (ঝুম চাষ)
নেপালী মারুয়া—ডিসেম্বর-জানুয়ারী (স্থায়ী চাষ)
টোটো মারুয়া—মার্চ-এপ্রিল (ঝুম চাষ)

শিকার তাহাদের নিকট অজানা। শিকারের কোন যন্ত্রপাতিও নাই এবং ইহার সহিত কোন পূজাপার্বণও নাই। প্রাচীন কালে শিকার থাকিলেও তাহার কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু মাঝেমাঝে ইহারা মৎস্য শিকার করে। ছোট ছোট ঝরনাতে বা তোর্সা নদীতে ছাঁকনি জাল, খ্যাংলা জাল দ্বারা মাছ ধরে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে, পাটাং বা দা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পাটাং দ্বারা জঙ্গলের গাছপালা কাটে এবং কাওনি চাষের জন্য মাটিতে গর্ত করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। বাঁশের ছিলা তৈয়ারী করিতেও কাজে লাগে। ইহারই ছোট মাপের ছুরি দ্বারা সুপারী কাটে। আর এক রকমের বড় ছুরি যাহাকে বলে 'ডারিয়া'। ইহা বাঁশ, কাঠ, গাছ এবং জীবজন্তু কাটার জন্য ব্যবহার করে। কয়েকটি পরিবারে লাঙল এবং খন্তা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। শস্য ভাঙার জন্য পাথরের

'ওংটা' বা পাথরের যাঁতা দেখা যায়। উদুখলও প্রত্যেক বাড়ীতে ব্যবহার করে।

আগুন জ্বালান পদ্ধতি—উনানে আগুনকে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়া তাহাদের রাত্রের অন্ধকার দূর করে। যখন ঘরের বাইরে যায় তখন এক গোছা শুকনা কঞ্চিকে জ্বালাইয়া যাতায়াত করে। এখনও তাহারা চকমকির ব্যবহার করিয়া আগুন জ্বালায়; কিন্তু দেশলাই-এর ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। টোটোরা দেশলাইকে বলে 'দাওসিরি'।

পশুপালন—টোটোরা পশুপালনে খুব বেশী আগ্রহী নয়। তবে প্রত্যেক পরিবারে ১০টি মুরগী ও তিনটি শূকর থাকে। তাহাছাড়া বর্তমানে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রতিপালন করে।

খাদ্য ও পানীয়—টোটোরা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল। ভুট্টা, কাওনি এবং মারুয়া দ্বারা বৎসরের সাতমাস চলিয়া যায়। বাকী পাঁচমাস চলে জঙ্গলের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া বা অর্জিত টাকাকড়ির বিনিময়ে খাদ্যশস্য ক্রয় দ্বারা। দিনে দুইবার করিয়া প্রধান খাদ্য ভুট্টা, কাওনি বা মারুয়া সিদ্ধ করিয়া খায়। ইহার সহিত শাক-সব্জীর তরকারী খাইয়া থাকে। সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার ও দুপুরে ভুট্টা ভাজা ও চা খায়। সব জিনিসই সিদ্ধ করিয়া খায়। তেলে ভাজিয়া খায় না। লঙ্কা আর লবণ ছাড়া অন্য আর কিছু মসলা খাদ্যে ব্যবহার করে না। কাঁঠাল এবং আম কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকে। কেবলমাত্র ঘোড়া, হস্তী, সাপ, ব্যাঙ, বানর, কুকুর, বিড়াল বাঘের মাংস ছাড়া সকল মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা পচা মাংস খাইতে খুব ভালবাসে। অসুখে বা বাঘের দ্বারা গরু মারা গেলে সেই মরা মাংস খাইয়া থাকে। অনেক সময় কয়েকদিন মাংসকে পচাইয়া সেই মাংস খায়। মাছ ইহারা খাইতে ভালবাসে না। শুকা মাছ অনেক সময় খায়। টোটোরা তাহাদের ঝুম চাষের ফসল কাওনি আর মারুয়া থেকে 'এউ' নামে এক প্রকার মদ তৈয়ারী করিয়া খায়। ইহারা খুবই চা খায়। কিন্তু চা পাতা হইতে চা তৈয়ারী করে না। কয়ার গাছের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ রস চা হিসাবে খাইয়া থাকে। ইহাতে কোন চিনি বা দুধ দেয় না। ইহারা কোন সময় দুধ পান করে না। পান খাইতে ভালবাসে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—টোটোদের গ্রামের নাম 'টোটোপাড়া'।

টোটোপাড়া গ্রামটি দশটি ভাগে বিভক্ত যেমন, পঞ্চায়েতগাঁ, মণ্ডলগাঁ, সুব্বাগাঁ, মিত্রাংগাঁ, তুমছিগাঁ, পূজাগাঁ, পঙ্কগাঁ, মানগরগাঁ, পোয়ারগাঁ, এবং কবরাবতী। প্রথমের সাতটিতে কেবলমাত্র টোটোরাই বাস করে এবং শেষের তিনটিতে বেশীর ভাগই নেপালীদের বাস।

গ্রামটি ত্রিভুজাকৃতি, উত্তর দক্ষিণে ইহা তিন মাইল চওড়া এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া আধ মাইলে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের মানুষ গোত্র অনুযায়ী পাড়া তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে। ঘরগুলি ইতস্ততঃভাবে বিন্যস্ত কোন নির্দিষ্টভাবে সজ্জিত নয়। ঘরগুলি বাঁশের পাটাতনের উপরে বাঁশের ছিলার দেওয়াল দ্বারা তৈয়ারী। চার কোণাতে চারিটি কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া বাঁশের পাটাতন তৈয়ারী করে এবং ঘরগুলি দোচালা বাঁশের কাঠামো এবং ঘাস দ্বারা ছাওয়া। এক একটি ঘরে একটি পরিবার বাস করে এবং ইহার তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রথম কামরাটিতে শয়নঘর, দ্বিতীয়টিতে অতিথিদের থাকার কামরা এবং তৃতীয়টিতে গৃহদেবতার স্থান। সামনের দিকে বারান্দামত থাকে যেখানে জ্বালানি কাঠ এবং গৃহস্থালীর বাসনকোসন রাখে। পাটাতনের নিম্নে খোলা জায়গাকে বাঁশ বা কাঠের খণ্ড দ্বারা ঘিরিয়া তাহার মধ্যে শূকর, ছাগল, মুরগী রাখার ব্যবস্থা করে। কোন কোন ঘরের পাশে রান্না করার জায়গাও থাকে। প্রধান ঘরের সংলগ্ন ঘরের সহিত আর একটি ঘর থাকে যেখানে বিধবা মেয়ে বা পুরুষ বাস করে ইহাকে বলে 'টুংসা'। প্রত্যেক গৃহস্থেরই ঘরের এক কামরাতে পূর্বপুরুষের আত্মার 'চিমার' অধিষ্ঠান।

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র—প্রত্যেক পরিবার এ্যালুমিনিয়মের বাসন ব্যবহার করে। মাটির পাত্রের ব্যবহার খুব কম পরিবারেই দেখা যায়। জল সঞ্চিত রাখার জন্য বাঁশের নল (গোজা) ব্যবহার করে। বাঁশের ঝুড়িতে (ডকো) খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য ব্যবহার করে। তাহারা 'পয়পা' বা সিপুই (কাঠের তৈয়ারী গ্লাস)-এর সাহায্যে জল পান করে। খাদ্য খাওয়ার জন্য থালা ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। সাধারণত পাতাতে করিয়া খাদ্য খায়। মদ তৈয়ারীর জন্য ওটি (মাটির পাত্র), জিটিং (বাঁশের ঝুড়ি) ছাকনির কাজ করে, 'তেহাটি' (লাউ-এর চামচ) এবং জিটান (হাতলের কাজ করে) প্রভৃতি ব্যবহার করে। কোন পরিবারেরই তেমন কোন ঘরের বিছানাপত্র বা খাটিয়া নাই। ঘাসের ব্যাগ তৈয়ারী

করিয়া তাহারই উপর ঘুমায়। কোন কোন পরিবারে শীতকালে শীত নিবারণের জন্য কম্বল ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—টোটোদের পোশাকে তেমন কোন ঘটা নাই। দুই গজ লম্বা এবং একগজ চওড়া একটা মোটা কাপড় পুরুষরা পরে, কাপড় ঝুলে থাকে হাঁটু পর্যন্ত। টোটো মেয়েরা ব্যবহার করে ৩ গজ লম্বা এবং ১½ গজ চওড়া মোটা কাপড়, কোমর থেকে হাঁটু ছাড়িয়া ঝুলিয়া থাকে। আর একটি টুকরা কাপড় কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে। আর এক টুকরা কাপড় দ্বারা বুক এবং পিঠকে ঢাকিয়া রাখে। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা হাফ্-প্যান্ট ও শার্ট পরিতে শুরু করিয়াছে। মেয়েরা রূপার গহনা পরিতে পছন্দ করে। রূপার হার, রূপা বা দস্তার চুড়ি, রূপার আংটি, কানের রিং প্রভৃতি তাহাদের দেহের আভরণ। বর্তমানে দু-একজন যুবককে হাতঘড়ি পরিতেও দেখা যায়। সেগুলি নেপালী ব্যবসাদারদের নিকট কিস্তিতে ক্রয় করা।

হস্তশিল্প—টোটোরা সূতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতে পারদর্শী; কিন্তু মিলের তৈয়ারী কাপড় বাজারে কিনিতে পাওয়ায়, হাতে-বোনা কাপড় কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সুইডিস্ মিশন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেহ কেহ সূতা কাটা তাঁতের কাজ শিক্ষা লইতেছে। তাহাছাড়া নেপালীদের সংস্পর্শে আসিয়া কামারের কাজে লোহার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে শিখিতেছে।

সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম—টোটোরা সংখ্যায় খুব কম বলিয়া নিজেদিগকে একটু আড়ষ্ট ভাব করিয়া রাখে। সচরাচর অন্যান্য প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সহিত মিশিতে চায় না। তথাপি ভোটিয়া ও নেপালীদের সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলে। সমগ্র টোটো সমাজটি কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত।

গোত্র—সমগ্র সমাজ তেরটি ছোট-বড় গোত্রে বিভক্ত। যেমন, বাউদবেই, বাদুবেই, লিংকাজীবেই, নুরুন চাংগোবেই, ধীরেন-চাংগোবেই, নিউবিবেই, বাংগোবেই, ডাংট্রোবেই, ম্যাংট্রোবেই, মাংকোবেই, মাংচিংবেই, পিসোচাংবেই। গ্রামের মধ্যে এক একটি গোত্র অনুযায়ী পাড়া তৈয়ারী করিয়াছে। একই গোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মাতার গোত্রে বা মাতার বোনের স্বামীর গোত্রে একই পুরুষে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিভিন্ন

গোত্রের বিভিন্ন পূর্বপুরুষের দেবতা থাকে এবং নানাভাবে পূজা পাইয়া থাকে। গোত্রগুলির নিজস্ব গোত্র দেবতা গাছপালা জীবজন্তুর নামে হইয়া থাকে। বাংগোবেই, ডাংট্রোবেই, পিসোচাংবেই গোত্রের লোকেরা কোন দিনই কাঠবিড়াল এবং বানর স্পর্শ করে না এবং অপর কোন গোষ্ঠীর লোকের হাতে রান্না খাদ্য খাওয়ায় বাধানিষেধ নাই। বাদুবেই, বাউদবেই, লিংকাজীবেই, নুরুন-চাংগোবেই, ধীরেনচাংগোবেই, নিউবেই প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা বানর এবং কাঠবিড়াল স্পর্শ করে না এবং একমাত্র ভোটিয়া ছাড়া আর কোন গোষ্ঠীর স্ত্রীলোকের স্পর্শে রান্না খাদ্য খায় না। ডাংকোবেই, মাংকোবেই,মাংট্রোবেই, মাংচংবেই গোত্রের লোকেদের সে রকম কোন ধর্মীয় বাধানিষেধ নাই। প্রত্যেক গোত্রের একটি করিয়া গোত্রঘর থাকে। সেখানে সেই গোত্রের লোকেরা যৌথভাবে ব্যবহার করে।

পরিবার—গোত্রগুলি কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত। টোটোদের মধ্যে প্রাথমিক পরিবারই প্রধানত দেখা যায়। অবিবাহিত যুবকেরা আলাদা ঘরে ঘুমায়। পুত্রের বিবাহের পর বৃদ্ধ পিতা ও মাতা পুত্রের নিকট হইতে আলাদাভাবে বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে বহুস্ত্রীমূলক পরিবারও দেখা যায় অর্থাৎ স্বামী তাহাদের একের বেশী স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাদের লইয়া বসবাস করে। একান্নবর্তী পরিবারও টোটোদের মধ্যে অল্পসংখ্যক দেখা যায়। এই রকম পরিবার টোটোদের পিতামাতা সন্তান-সন্ততি ও কাকা-জ্যাঠার সংসার লইয়া গঠিত।

জীবনচক্র—টোটোদের জীবনচক্র জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত।

জন্ম—যখন বুঝিতে পারে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে তখন ভারী কাজ করা বন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। প্রসবের জন্য আলাদা ঘর থাকে না। শয়নঘরের এক কোণে কাপড় টাঙাইয়া আলাদা করিয়া দেয় এবং সেখানেই প্রসব হইয়া থাকে। শিশুর জন্ম হওয়ার সময়ে যদি বুঝিতে পারে কোন অশরীরী আত্মার কু-দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা হইলে এই কু-দৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য তুক-তাক্, যাদুমন্ত্র করিয়া থাকে এবং অশরীরী আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শূকর অথবা মুরগী বলি দেয়। টোটোদের মধ্যে কোন ধাত্রী মাতা থাকে না। যে কোন বৃদ্ধা মহিলা ধাত্রী মাতার কাজ করে। শিশুর জন্ম হওয়ার পর ঐ বৃদ্ধা মহিলা বাঁশের

ধারাল ছিল্‌কা দ্বারা নাভী ছেদন করে। শিশুর জন্মের সাতদিনের দিন অথবা নয়, এগার অথবা পনেরো দিনের দিন সদ্যজাত শিশুর মাতা সুতা কাটিয়া, সেই সুতা হলুদে রঙ করিয়া শিশুর হাতে বাঁধিয়া দেয়।

নামকরণ উৎসব—সাতদিনের দিনে শিশুর সুতা বন্ধনের উৎসবের দিনই গ্রামের চৌকিদার, অথবা গ্রামের প্রধান অথবা পূজারী আসিয়া শিশুর নামকরণ করে। প্রথমে নামদাতা ও পরে সকলে মিলিয়া মদ পান করে এবং শিশুকে আশীর্বাদ (জানওয়ালা) করে। তারপর নামদাতা গ্রামে ঘুরিয়া সকলকে সেই নাম জানাইয়া দেয়। সাধারণতঃ ঠাকুরদা-ঠাকুরমার নামে শিশুর নামকরণ করিয়া থাকে। ছেলেদের নাম সাধারণতঃ জেঙ্গা, হোসে, আমেফা এবং মেয়েদের নামের শেষে 'মা' যুক্ত থাকে যেমন মটেংমা, শিংগ্রমা, আংচুমা ইত্যাদি। পোষ্যপুত্র বা কন্যা লইতে ইচ্ছা করিলে লইতে পারে কিন্তু ইহার জন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। কেবলমাত্র তাহাকে খাওয়ালেই অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং ঘরে তুলিয়া লয়।

বিবাহ—ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ দুই ধরনের বিবাহ টোটো সমাজে প্রচলিত। সবথেকে সম্মান জনক বিবাহ হইতেছে 'দাবা-বেহোইয়া' (বড় বেহোইয়া) এবং অপরটি হইতেছে 'জীপিয়া বেহোইয়া' (ছোট বেহোইয়া)। দাবা-বেহোইয়া বিবাহে বেশ কয়েকটি গরু বলিদান দিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা সারা গ্রামকে ভোজ দেয় এবং জীপিয়া বেহোইয়া বিবাহে কেবলমাত্র দুইটি গরু অথবা দুইটি শূকরকে বলিদান দিয়া তার মাংস দ্বারা ভোজসভার আয়োজন করে। টোটোদের মধ্যে এক-বিবাহ রীতিই বিদ্যমান, তবে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের নিদর্শনও নাই এমন নয়। শালী বিবাহও দেখা যায় ছোট ভাই এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা টোটো সমাজে প্রচলিত নিয়ম নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একবছর পরে স্বামী, স্ত্রীর ছোটবোনকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ভাইকে বিবাহ করা একেবারে নিষিদ্ধ। বিধবা বিবাহ ইহাদের সমাজে প্রচলিত। আত্মীয় বিবাহ সমাজে স্বীকৃত কিন্তু জ্ঞাতি বিবাহ সমাজে নিয়ম নাই। দুই বোনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে; কিন্তু এই বিবাহের পূর্বে একটি শূকর উৎসর্গ করিতে হয়। ছেলে যখন বিবাহের উপযুক্ত হয় তখন ছেলের মামা বা মেসো বা পিসে পাত্রীর সন্ধান করে এবং সন্ধান পাইলে তাহারা পাত্রীর বাড়ীতে

উপস্থিত হয় এবং দুই কলসী 'এউ' (মদ) এবং মুরগী লইয়া যায়। কন্যার পিতা এই উপহার গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে বিবাহের প্রাথমিক কাজ শেষ এবং তাহার সম্মতি আছে, তখন উভয় পক্ষ মিলিয়া মদ এবং মাংস ভোজন করে এবং কন্যার পিতা কন্যাকে তাহাদের সহিত ছেলের বাড়ীতে আসিবার অনুমতি দেয়। কনে বরের বাড়ীতে আসার তিনদিন পরে দু-পক্ষের লোকজন একত্রে খাওয়াদাওয়া করে, আর নব-দম্পতির নতুন নামকরণ হয়। সেই নামেই সমাজে পরিচিত হয়। ছেলের বাড়ীতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই একত্রে সহবাসের সম্মতি পাইয়া থাকে। যখন মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের দিন সাধারণতঃ শীতকালে স্থির করিয়া থাকে। যে সমস্ত পরিবারের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বীকৃতি আছে তাহারা স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বার পূর্বেই বিবাহ অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। বরের পিতা অন্তঃসত্ত্বার খবর পাইলে বরের পিতা এবং 'দাদুবেই' গোষ্ঠীর একজন লোক উৎসবের দিন স্থির করে। বিবাহের সময় কনে মাথায় ঢাকা পরিধান করে ইহাকে বলে 'জয়ামি' এবং দিনের বেলা বিবাহ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বিবাহে বরের পক্ষের সকলে এবং কনের পক্ষের লোক উপস্থিত থাকে। ঐ দিন গরু বলিদান দেওয়া হয়। কিন্তু গরু মাংস, এউ—দাদুবেই গোষ্ঠীর লোকটি দেবতা ইস্ফাকে নিবেদন করে। ইহাতেই বিবাহ কার্য সমাধা হয় এবং তিনদিন ধরিয়া ভোজ চলিতে থাকে। এই বিবাহকে জীপিয়া বেহোইয়া বিবাহ বলে। 'দাবা-বেহোইয়া' বিবাহে কনে হয় বরের থেকে বয়সে বড়। আর এই বিবাহে খরচ হয় আগের বিবাহের তিন গুণ। এই বিবাহে গর্ভ-সঞ্চারের সঙ্গে সামাজিক স্বীকৃতির কোন যোগ নাই।

মৃত্যু ও সৎকার—টোটোদের ধারণা দুষ্ট শক্তির আক্রমণই হইতেছে মৃত্যুর কারণ। এই দুষ্ট শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গুণীনের ক্রিয়া অনুযায়ী তাহারা মুরগী, পায়রা এবং শূকর বলি দেয়। অসুখে মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মনে করে। কাহারও অসুখ করিলে ওঝার কথা মত গাছগাছড়া বা মূল ওষুধ হিসাবে খাওয়াইয়া থাকে। মৃতদেহকে তাহারা কবর দেয়। সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার যদিও কোনদিন টোটোরা তীর ধনুক ব্যবহার করে না তবুও মৃতদেহের হাতে তীর ধনুক দেয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই দাদুবেই গোত্রের একজন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কয়েকজন মিলিয়া জঙ্গল

হইতে কাঠ সংগ্রহ করিতে যায়, খাট প্রস্তুত করার জন্য। মৃতদেহকে কবর দেওয়ার জন্য অপর কয়েকজন কবর স্থানে গর্ত খুঁড়িতে থাকে। বাতুবেই গোত্রের লোকটি মৃত ব্যক্তির ঘরের চাল হইতে একটি খড় টানিয়া পুড়াইয়া ফেলে এইভাবে পুরুষ মৃতের ক্ষেত্রে ছয়বার এবং স্ত্রী মৃতের ক্ষেত্রে পাঁচবার করিয়া থাকে। কবর স্থানে লইয়া যাইবার পূর্বে মৃতদেহকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া দেয়। তারপর গাছের শাখার পাটাতন তৈয়ারী করিয়া ইহার উপর শায়িত করে এবং শোকযাত্রা করিয়া কবরস্থানে লইয়া যায়। ইহার অগ্রভাগে থাকে বাতুবেই গোত্রের লোকটি। যাহারা বহন করে তাহাদের মধ্যে দুইজন থাকে মৃত ব্যক্তির গোত্রের লোক। কবরস্থানে পৌছিয়া মৃতদেহর মাথাকে উত্তর দিকে রাখে এবং একটি পান ও সুপারি উৎসর্গ করে। তারপর মৃতদেহকে কবর দেয়। কবর দেওয়া শেষ করিয়া সকলে হাত ও পা ধৌত করিয়া মৃতব্যক্তির বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পুনরায় পুরুষ মৃতদের ক্ষেত্রে ছয়দিনের দিন এবং স্ত্রীলোকের মৃতদের ক্ষেত্রে পাঁচদিনের দিন সকলে আসিয়া মদ পান করে। এই কয়েকদিন মৃত পরিবারের কেহ অন্য পরিবারে খায় না। ভোজনের দিন বাতুবেই গোত্রের লোকটি ধুপ ধুনা দিয়া ঘরকে পবিত্র করে। আর কোন অনুষ্ঠান হয় না। কাহারও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার স্বামীর এক বৎসর অশৌচ থাকে ঐ সময় নখ চুল কাটে না এবং অন্য কাহারও ঘরে খায় না। এক বৎসর পরে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কোন স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যু হইলে এক বৎসর অশৌচ থাকে এক বৎসর পরে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কাহারও পিতার মৃত্যু হইলে ছয়দিন অশৌচ পালন করে এবং মাতার মৃত্যু হইলে পাঁচদিন অশৌচ পালন করে।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার—কোন ফল চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না। টোটোপাড়ার সমস্ত আঞ্চলিক সম্পত্তি 'মণ্ডলের' নামে থাকে। মণ্ডল এই জমির জন্য বৎসরে ১২০ টাকা করিয়া কর দেয়। মণ্ডল প্রত্যেক পরিবারকে ২.২৫ টাকা করের বিনিময়ে কিছু করিয়া জমি ভাগ করিয়া দেয় কিন্তু তাহারা মালিক হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি গাছ লাগাইলে সেই ব্যক্তির সম্পত্তি হয় এবং সেই গাছ বংশানুক্রমিক ভাবে পুত্ররা পাইয়া থাকে কিন্তু জমির মালিক হইতে পারে না। পূর্বে টোটোপাড়াতে প্রচুর পরিমাণে

কমলালেবু জন্মাইত। প্রত্যেক পরিবার আলাদাভাবে গাছ লাগাইলে পারিবারিক সম্পত্তি হইত। কিন্তু বর্তমানে সমস্ত গাছ মরিয়া যাওয়ায় জমিগুলি গ্রামীণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। সুপারি গাছ, বাঁশ গাছ পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। ছাগল, শূকর, মুরগী ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রত্যেকের তার নিজস্ব সম্পত্তির উপর অধিকার থাকে।

সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। প্রত্যেক পুত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তির সমান অধিকার পাইয়া থাকে। মেয়েরা সম্পত্তির কোন অংশ পায় না। পিতার মৃত্যু হইলে তাহার মা ও নাবালক ভাই-বোনেদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব পুত্রের মধ্যে থাকে।

গ্রাম সংগঠন—টোটোদের গ্রাম শাসিত হয় চিরাচরিত পরিষদ দ্বারা। পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতেছে কাজী, মণ্ডল, পঞ্চায়েত, বার্তাবাহক চৌকিদার। কাজী হইতেছে প্রধান ধর্মযাজক। এই স্থান বংশানুক্রমিক। গ্রামের কোন সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কাজী গ্রামের বয়স্কদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া থাকে। পূর্বে কাজী ও মণ্ডলের একই কার্যালয় ছিল কিন্তু; বর্তমানে আলাদা হইয়া গিয়াছে। মণ্ডল হইতেছে বিষয়-সম্পত্তির বিচারক। ইহাও বংশানুক্রমিক। জমি-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে কোন বাধাবিপত্তি উৎপন্ন হইলে গ্রামের বয়স্কদের সহিত আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকে। পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হইতেছে সামঞ্জস্যপূর্ণ চৌকিদারী কর ঠিক করা। তাহা ছাড়াও গ্রামের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করা। ইহাও গ্রামের বয়স্কদের সহিত আলোচনা ও মতামত অনুযায়ী ঠিক করিয়া থাকে। বার্তাবাহকের কাজ হইতেছে কাজী ও মণ্ডলের খবরাখবর গ্রামে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং গ্রামবাসীদের আদেশ জারি করা। চৌকিদারের কাজ পঞ্চায়েতের ক্রিয়াকলাপ, বিচারআচার প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা। টোটোদের বিচারের আদালতকে বলে 'ডেম্-শা'। বিচারের সময় ডেম্-শাতে পঞ্চায়েত সভা বসে। এবং আরও দশ-বারজন গ্রামের বয়স্ক সভাতে উপস্থিত থাকে। সাধারণতঃ ২।১ দিনেই এক-একটি বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্তমানে টোটোদের গ্রাম পঞ্চায়েত নয়জন নির্বাচিত সভ্য লইয়া গঠিত।

ইহার মধ্যে ছয়জন নেপালীদের মধ্য হইতে এবং টোটো হইতে তিনজন। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে গ্রাম অধ্যক্ষ বলা হয়।

ধর্ম ও উৎসব—টোটোদের প্রধান পূজারীর নাম 'কাজী'। কাজীর সহকারী হইতেছে 'দেওসী'। দেওসীই কাজীর পরিবর্তে সকল প্রকার পূজা অর্চনার কাজ করিয়া থাকেন। এই দুইজন পূজারী ছাড়া আরও কয়েকজন পূজারী থাকেন, যাঁহারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন। 'মহাকাল' হচ্ছেন টোটোদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। ইস্পা বা সাঞ্জা নামে তাঁহারা এঁর বন্দনা করিয়া থাকেন। টোটোদের প্রধান উৎসবের নাম ওংচু (কাওনি পূজা), মায়ু (কমলালেবু পূজা), মান্‌কানিন সারোধ, গরাম, ফাগু পূজা ইত্যাদি। টোটোরা নিজেদের ধর্মীয় আচরণে হিন্দু প্রভাব আছে বলিয়া মনে করে। জুলাই-আগষ্ট মাসে পূর্ণিমা তিথির চোদ্দদিন পরে অথবা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ণিমার তিথির পনেরো দিন পরে সকলে মিলিয়া মহাকাল বাড়ীতে যায়। সেখানে জুলাই-আগষ্ট পাঁচদিন অথবা আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে নয়দিন করিয়া অতিবাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই কয়েকদিনের জন্য একটি গ্রাম গড়িয়া উঠে। এই সময় মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরিবার দশজোড়া করিয়া মোরগ ও মুরগী এবং একজোড়া করিয়া শূকর উৎসর্গ করে। ইহাকে কালেশ্বর পূজা বলে। মহাকাল হইতেছে সব থেকে শক্তিশালী দেবতা। ইহার কোন প্রতিকৃতি নাই। মহাকালের পূজার জন্য কলাপাতা, চাল, মদ, মাংস উৎসর্গ করে। গরু এবং শূকরকে বলি দেওয়ার প্রথা নাই। ইহাদের সুঁচাল অস্ত্র (পাটাং) দ্বারা হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করা হয় তারপর গোদা দ্বারা পিটাইয়া মারা হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করে যাহাতে প্রাণীর রক্ত বাহিরে আসিতে না পারে। বর্তমানে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ গো-হত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে 'দেওসী' মহাকালের উদ্দেশ্যে মদ এবং মাংস উৎসর্গ করে। পরে মাংস রান্না করিয়া সকলে মিলিয়া মদ এবং মাংস খায়।

টোটোদের অপর দেবতা হইতেছে 'পিদুয়া'। মহাকালের পরেই পিদুয়ার স্থান। ভূত-প্রেত, ডাইনী হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষা করে। তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য একজোড়া সাদা মোরগ, একজোড়া পায়রা উৎসর্গ করে।

গরাম বা গ্রাম পূজা হইতেছে গ্রামের কল্যাণের জন্য পূজা। গ্রাম থেকে ব্যাধি দূর করার জন্য এই পূজা। এই পূজার জন্য বাহির হইতে

পূজারী আনিতে হয়। পূজাতে মেয়েরা অংশগ্রহণ করিতে পারে না। এই পূজায় পনরোটি পায়রা, দু'টি শূকর, একটি পাতিহাঁস, তিনটি ছাগল (লাল, কালো, সাদা), মোরগ, মুরগী, মুরগীর ডিম প্রভৃতি উৎসর্গ করে।

টোটোদের মধ্যে সবথেকে বড় এবং পবিত্র পূজা হইতেছে মহাকালী (ইস্পা)। টোটোপাড়াতে এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মহাকালী খুব বড় মন্দির। টোটোদের ঘরের ঢংএ তৈয়ারী। ইহার সহিত আরও কয়েকটি ঘর থাকে। দুইটি জয়ঢাক ভিতরের ছাদ হইতে ঝুলান। প্রধান পুরোহিত দেবীর পূজা করেন এবং ভাত, মদ ও মাংস উৎসর্গ করেন। পরে সকলে মিলিয়া এই উৎসর্গকৃত মাংস ভক্ষণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পূজারীরা গান বাজনা করিতে থাকে। টোটো মেয়ে পুরুষেরাও দূরে দূরে আলাদা আলাদা সারিতে নৃত্যগীত শুরু করে। এই ভাবে উৎসবে সকলে অংশ গ্রহণ করে। ইহারা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, রাস্তার পূজাও করিয়া থাকে।

টোটোরা নানা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। তারা মনে করে দুষ্ট ভূত সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। তাহাদের কু-দৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য নানা তুক্‌তাক্ যাদুমন্ত্র করে। গুণীন্ ভূতদের আয়ত্তে আনে এবং বুঝিতে পারে কোন্ ভূত আক্রমণ করিয়াছে। ভূতকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুরগী, পায়রা শূকর উৎসর্গ করে।

টোটোদের জন্য কল্যাণ—১৯৫১ সালে ভারত মহাজাতি মণ্ডলী স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল টোটোদের উন্নয়ন করা। ইহার আর্থিক সাহায্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। মহাজাতি মণ্ডলের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর পরিচিতি ছিল ডাক্তার হিসাবে। যে সকল কাজে হাত দিয়াছিলেন সেগুলি হইল :

(১) টোটো ও লেপ্‌চা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া (২) তাহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে শিক্ষা দেওয়া (৩) জমি রক্ষা করা (৪) কৃষি অফিসারের সহযোগিতায় উন্নত ধরনের কৃষি শিক্ষা দেওয়া (৫) সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষার জন্য ভ্যাকসিনেসন্ ও ইনুকুলেশন দেওয়া (৬) বাঁশ রপ্তানী বন্ধ করা (৭) তাঁত শিক্ষা দেওয়া। এই সকল উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা টোটোদের উপর লওয়া হয়। পরবর্তী ১৯৫৫ সালে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রসর হন এবং একজন সহকারী

সংগঠক (Organizer) নিযুক্ত করেন। তাঁহার কাজ ছিল : (ক) টোটো ও লেপ্‌চা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দান (খ) সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা অবিহিত হওয়া (গ) তাহাদের নানা বিষয়ের সমাধানের জন্য সরকারী কার্যনির্বাহক কমিটির সহিত সংযোগ রক্ষা করা। তাহাছাড়া আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ একজন লোক নিযুক্ত করেন যাঁর কাজ শিক্ষকতা একই সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করা এবং কৃষি বাজার সমিতির কাজ নিরীক্ষা করা প্রভৃতি। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লেপ্‌চাদের মধ্য হইতে একজন সহকারী সাংগঠনিক ও টোটোদের মধ্য হইতে একজন চৌকিদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য এবং সেই সমস্যা সমাধানই হইবে টোটোদের উন্নয়নমূলক কাজ।

ধাপ প্রথায় চাষী

লেপ্‌চা (The Lepcha)

লেপচারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সহজ সরলতা, বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক, বৈশিষ্ট্য সকল মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছে। দেশী এবং বিদেশী গবেষক, শাসক পর্যটকের লেখায় ইহাদের উদার মানসিকতার প্রশংসা করা হইয়াছে। 'রং' হইল লেপচাদের নিজস্ব নাম। লেপচা কথাটি আসিয়াছে নেপালী 'লাপ্‌চা' হইতে। একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে গোরখারা ইহাদের কিছুটা তাচ্ছিল্যভরে লাপচা বলিতেন। ইহাছাড়া লেপ্‌চা কথাটি আসার সম্বন্ধে নানা মতও প্রচলিত আছে। নেপালে লাপচা নামে এক শ্রেণীর মাছ আছে। লাপচা মাছ খুব নিরীহ প্রকৃতির। সেইজন্য ঘৃণায় নয়, তাহাদের এই প্রকৃতির জন্য প্রশংসা হিসাবে ইহাদের লাপচা বলিতেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজী উচ্চারণে এই লাপ্‌চা, লেপ্‌চা হইয়া গিয়াছে। লেপ্‌গদের বিষয়ে সমীক্ষা করেন ডঃ অমলকুমার দাস।

আদি বাসভূমি—লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। বহুকাল আগে তাহারা সেখান হইতে দার্জিলিঙে চলে আসে। লেপ্‌চারা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এই দলগুলির নাম রিংজংমু, তামজংমু এবং ইলামমু। লাপচা

ভাষায় মু মানে অধিবাসী। কাজেই রিংজংমু, তামজংমু ইলামমু অর্থে রিংজং, তামজং ও ইলামের অধিবাসী। এই স্থানগুলি সিকিমের তিনটি অঞ্চল। বহুকাল পূর্বে তিব্বতের এক রাজপুরুষ (বর্তমান সিকিমের মহারাজার পূর্বপুরুষ) একদল তিব্বতী লইয়া সিকিমে আসেন এবং সিকিমের রাজা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীরা সিকিমেই বসবাস করিতে শুরু করেন। শান্তিপ্রিয় লেপচারা তিব্বতীদের বাধা দেয়নি এবং ক্রমে তাহাদের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। সিকিমে রাজ পরিবারের অনেকের লেপচাদের সহিত বিবাহ সূত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

বর্তমান আবাস—লেপচারা পশ্চিমবঙ্গের তফশিলী আদিবাসী সম্প্রদায়। ১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৪,৫৬৮ অর্থাৎ ইহাদের পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার ·৫৮ শতাংশ মাত্র। ইহাদের বাস প্রধানত দার্জিলিং জেলার কলিম্পঙ মহাকুমার কলিম্পঙ এবং গরুবাথান থানায়। সিকিম, নেপালেও বর্তমানে লেপচাদের বসবাস করিতে দেখা যায়। আর অল্প পরিমাণে ভুটানে বাস করে।

ভাষা—লেপচাদের ভাষা তিব্বতীয়- চীনা গোষ্ঠীর তিব্বতীর হিমালয় শ্রেণীভুক্ত। ইহাতে মুণ্ডারী ভাষারও প্রভাব রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও তাহারা মাতৃভাষায় কথা বলে। কিন্তু কতকগুলি গ্রামাঞ্চলে এবং সাধারণ শহরাঞ্চলে ইহাদের ভাষায় নেপালী প্রভাব রহিয়াছে।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

পেশা—লেপচাদের প্রধান প্রধান পেশা হইতেছে কৃষিকার্য, মজুর; অনেকে চাকুরীজীবী ও শিল্পী।

কৃষিকার্য—অধিকাংশ লেপচাই কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে অনেকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করিতে শিখিয়াছে। কৃষিজীবী লেপচাদের মধ্যে দরিদ্র চাষীর সংখ্যাই বেশী। এই শ্রেণীকেও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:—

(১) সম্পূর্ণ নিজের বা প্রধানত নিজের জমির মালিক।

(২) সম্পূর্ণটা নিজের নয় অর্থাৎ ভাগচাষী।

(৩) ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক।

লেপচাদের কৃষিকাজে 'ঝুম' প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারা জঙ্গল

পুড়াইয়া সেখানে দু-তিন বৎসর চাষ করিত, পরে আবার অন্যত্র চাষ করিত। বর্তমানে অধিকাংশ লোক সিঁড়ি প্রথায় চাষ করিয়া থাকে। দূর হইতে দেখিলে চাষের জমিকে চওড়া সিঁড়ির মত দেখায়। এই চাষে স্ত্রী পুরুষ সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সমতলভূমির মত একই পদ্ধতিতে লাঙল প্রথায় চাষ করে। লেপচারা চাষযোগ্য জমিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে: (ক) পানিখেত (খ) শুখাখেত। (ক) পানিখেত জমিতে জল জমিয়া থাকে এবং সেচ দেওয়া যায়। এই জমিতে ধান (যো) এবং ভুট্টা (মকাই) জন্মাইয়া থাকে। (খ) শুখাখেত অর্থে শুষ্ক জমি। এই জমি জোয়ার (কোদো) চাষের উপযুক্ত। পাহাড়ের জমি কোথাও এত শক্ত যে তাহাতে হাল চলে না। আবার এমন জমিও আছে সেখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। জমিগুলি সমুদ্রতল হইতে ৯৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ধান চাষ হইয়া থাকে সমতলভূমি হইতে প্রায় ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে। সুতরাং ধান চাষের পক্ষে এই সকল জমি অনুপযুক্ত।

লেপচাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর কৃষিজীবী দেখা যায়। এক শ্রেণী তাহারা নিজেদের জমি চাষ করিয়া থাকে, আর এক শ্রেণী অপরের 'আধি' বা অর্ধেক ভাগ ব্যবস্থায় চাষ করিয়া থাকে। লেপচা গ্রামে ঢুকিলেই চারিদিকে বিভিন্ন রকম ফুলের বাহার দেখা যায়। এখানকার জমি ফুলের চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত।

কৃষিকাজ ছাড়াও লেপচারা শিকার এবং মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। পশুপালন তাহাদের একটি বড় জীবিকামূলক কাজ।

মজুর—লেপচারা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল হইলেও বেশ কিছু লেপচা মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই মজুর দুই ধরনের হয় কৃষিমজুর এবং দিনমজুর। অপরের জমিতে কৃষিকার্য করিয়া মজুরী পাইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে শহরের কাছাকাছি যাহারা বাস করে, তাহারা কুলি বা মোটর গ্যারেজে কাজ করিয়া নগদ টাকা রোজগার করে।

চাকুরী—বর্তমানে অনেক লেপচা, শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

হস্তশিল্প—লেপচাদের চিরাচরিত হস্তশিল্প হইতেছে হাতে-বোনা তাঁত-শিল্প। ইহাদের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ হস্তশিল্পী আছেন এবং কেহ কেহ

তাহাদের জীবিকার জন্য কাঠের কাজের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। লেপচাদের সৌন্দর্যবোধ জন্মগত, কিন্তু এই রকম শিল্পকর্মের চাহিদা কম থাকায় তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে লেপচাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। বর্তমানে সরকারের নীতি হইতেছে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্তমানে লেপচারা অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন। প্রধানত কৃষিজীবী লেপচাদের নগদ আয় খুবই কম। পশুপালন থেকে যা আয় হয় তাও অত্যন্ত কম কারণ যে দুধ তাহারা উৎপাদন করিয়া থাকে তার অধিকাংশই তাহারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। বাকি অল্প দামেই দালালের নিকট বিক্রয় করে। লেপচারা প্রায় জনসংখ্যার অর্ধেক ৪৮.৬৯ শতাংশ ১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী কর্মী পর্যায়ভুক্ত। এই কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৬২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ৩৪.০১ শতাংশ এবং ২৭.৫৮ শতাংশ যথাক্রমে 'চাষী' ও ক্ষেতমজুর পর্যায়ভুক্ত। প্রায় ১১ শতাংশ চা বাগিচায়, বন, ফলের বাগান, পশুপালন ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। শতকরা ২২ জন বিভিন্ন ধরনের চাকুরীতে নিযুক্ত আছে। বাকী ৫ শতাংশ লেপচা কুটীর শিল্প, পরিবহন ব্যবসা ইত্যাদিতে জীবিকার্জন করিয়া থাকে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালু অংশে অবস্থিত লেপচা গ্রামগুলিকে বস্তী বলা হয়। চাষের জমি এবং জলের উৎসর কাছাকাছি সাধারণতঃ বস্তীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বস্তীগুলি কোন পরিকল্পনা-মূলক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। গ্রামগুলি পাহাড়ের ঢালুতে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি বাড়ি একসঙ্গে জোড়া—যেন একই ছাদের তলায় তৈয়ারী। মাঝখানে একটি সরু পথ দিয়া গৃহ-পুঞ্জগুলি বিভক্ত। কোথাও আবার একটি বাড়ি কাছাকাছি আর কোন বাড়ি নাই। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে যাওয়ার কোন সহজ পথ নাই।

অধিকাংশ লেপচা গ্রাম 'গুম্ফা' (পূজা অর্চনার স্থান) রহিয়াছে। ইহাই

সাধারণতঃ লেপচাদের মিলিত হইবার স্থান এবং এখানেই সমস্তরকম অনুষ্ঠান ও পার্বন সম্পন্ন হয়। লেপচাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুম্ফার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জলের উৎস সাধারণতঃ নদী, পুষ্করিণী, ঝর্ণা (ঝারি বা ঝরা) এবং কোন কোন গ্রামে বর্তমানে শহর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ্রামের এক একটি বাড়িতে কয়েকটি ঘর থাকে, যেমন—বাসের ঘর. খামার ঘর, গোয়াল ঘর প্রভৃতি। সাধারণতঃ বাসের ঘরের একটু দূরে গোয়ালঘর তৈয়ারী করা হয়। বাড়িগুলিতে যাহাতে আলো বাতাস আসিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৈয়ারী করে। ঘরের সামনে শাকসব্জি চাষ হয় এবং নানা রঙের ফুলের গাছও থাকে। দূর থেকে পাহাড়ের ঢালে গ্রামগুলি খুবই সুন্দর দেখায়।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—লেপচা পুরুষ ও নারীর পোশাককে লেপচা ভাষায় যথাক্রমে দম পা ও দম দিয়াম্ বলে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লেপচা পুরুষের পোশাককে বলে 'পাগি'। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাত দুটো খালি রাখিয়া গায়ে পরা হয় এবং কোমরে বাঁধা থাকে। লেপচাদের ধর্মীয় পোশাক হইল পাগি। খৃষ্টান লেপচারা পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক পরিধান করে। লেপচা নারীরা পরিধান করে উপরে ব্লাউজ নীচে সায়ার মত সূতী বস্ত্র। লেপচাদের গায়ের রং খুব সুন্দর। তাহারা কোন প্রসাধন বা কৃত্রিম অঙ্গসজ্জা ব্যবহার করে না। মাথার চুল লেপচা নারীর গর্বের বস্তু। দুই দিকে বিনুনি করিয়া চুল বাঁধে। গয়না লেপচা নারীর খুব প্রিয়। পাথরের বা পুঁতির মালা, সোনা-রূপার নক্সা করা গহনা পরিধান করিয়া থাকে। সোনা-রূপার গহনা সাধারণতঃ সামাজিক—ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিধান করে। 'লেয়াপ' হইতেছে দৈনিক ব্যবহারের গহনা।

সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম

প্রাচীনকালে রিংজং, তামজং এবং ইলাম এই তিনটি দল পৃথক সমাজ হিসাবে পরিগণিত হইত। পূর্বে রিংজং, তামজং ও ইলাম উপাধি ব্যবহার করিত। বর্তমানে ইলাম উপাধি নাই। কারণ নেপাল ইলামের বিশাল অংশ জয় করিয়া লইয়াছে। এই তিন দলের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার দিক হইতে রিংজংরা সকলের উপরে। তাহার পরেই ইলামের স্থান। রিংজং

এবং ইলামরা, তামজংদের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় না। একই দলে বা রিংজং ও ইলামদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। তামজংদের বিবাহ নিজেদের দলের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

লেপচারা আভ্যন্তরীণ অসবর্ণমূলক দশটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই দশটি গোষ্ঠী ছাড়াও কতকগুলি উপগোষ্ঠীও আছে এবং এই উপ-গোষ্ঠীগুলিও অসবর্ণ-মূলক ধরনের। সাধারণতঃ মায়ের গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় না।

গোত্র—সমগ্র লেপচা উপজাতিটি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। কিন্তু গোত্র-গুলি গাছ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি গোত্র দেবতার নামানুসারে হয় না। এই-গুলি বিভিন্ন জায়গার নাম থেকে লওয়া। গোত্রের লোকেরা যে সকল স্থানে বসবাস করিত সেই সকল নামই বহন করে এই সকল গোত্রগুলি। ছেলেরা পিতার গোত্র পাইয়া থাকে এবং মেয়েরা মার গোত্র পাইয়া থাকে। ছেলে-মেয়ে উভয়েই এই দুই গোত্রের কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদের বিবাহ করার জন্য তৃতীয় কোন গোত্র হইতে পছন্দ করিতে হইত।

পরিবার—লেপচাদের মধ্যে প্রাথমিক পরিবারই দেখা যায়। স্বামী স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যাদের লইয়া লেপচা পরিবার গঠিত। কখনও কখনও ঠাকুরদা ও ঠাকুমা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঠাকুরদা ও ঠাকুমার উপর সমগ্র কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে। স্বামীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে, স্ত্রীর গৃহস্থালীর কাজ। ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে।

বিবাহ—লেপচারা বিশ্বাস করে বিবাহ এবং পরিবার গঠন তাহাদের একটি সামাজিক কর্তব্য। বিবাহ বন্ধন একটি পবিত্র কাজ বলিয়া তাহারা মনে করে। সমাজে এক বিবাহ প্রচলিত। সাধারণতঃ পিতামাতার যোগাযোগ দ্বারাই বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। লেপচা ছেলেদের পক্ষে বিবাহ করা বিরাট ব্যয়বহুল, কারণ কন্যাপণ যোগাড় করার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়। ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহ করে। বিধবা বিবাহও ইহাদের সমাজে প্রচলিত। দেবরবরণ, বিধবা স্ত্রী স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করা অবশ্যই সমাজে কর্তব্য। কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাই-এর স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না। স্বামীর ছোট ভাই না থাকিলে, বিধবা তাহার স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি পিতৃগৃহে আনে।

শ্রম বিনিময়ে বিবাহও লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত। ভাবী জামাতাকে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে প্রায় তিন বৎসর শ্রম দেওযার পর বিবাহ করিতে পারে।

বর্তমানে বিধবা বা বিপত্নীকরা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে। বিধবা বিবাহ এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কন্যাপণ লাগে না। কুল পুরোহিত ও লামা এই বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

মৃত্যু ও সৎকার—লেপচাদের মধ্যে যাহারা জড়োপাসক তাহারা মৃতদেহকে কবর দেয়। আর যাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাহারা শবদাহ করে। এই উভয় ক্ষেত্রেই পুরোহিত বা লামা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে। শবদাহের পর লামা সেই ভস্মের কিছুটা গুম্ফায় লইয়া আসে। কিছুটা ভস্ম মৃতের পরিবারকেও দেওয়া হয়। লামা মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় চারদিনব্যাপী প্রার্থনা করে। তারপর সেই ভস্ম লইয়া নদীতে ভাসাইয়া দেয়। চিতাভস্ম নদীতে ভাসাইয়া দেওয়ার পর পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠান মৃত্যুর পর ৪র্থ, ৭ম, ২১শ ও ৪৯ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। লেপচারা দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে অকল্যাণ মনে করে। এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার—লেপচাদের পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে চাষের জমি, গরু, ছাগল, ভেড়া, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে কাপড়চোপড়, গহনা ইত্যাদি। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার স্থান অধিকার করে। পরিবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পুত্রের উপর আসে। এইভাবে পুরোহিতের বড় ছেলে পুরোহিত হয় এবং লামার ছেলে লামা হয়। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর একটি অংশ আছে কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সে সম্পত্তি পৃথক করিতে পারিবে না। জীবিত কাল পর্যন্ত ভোগ করার অধিকার পায়। স্বামী, স্ত্রীর সম্পত্তি দাবী করিতে পারে না। স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মারা গেলে সেই সম্পত্তি স্বামীর হস্তগত হয়। পিতার সম্পত্তি ছেলেরা সমানভাগে ভাগ পাইয়া থাকে। যদি ছেলে না থাকে, তাহা হইলে অবিবাহিত মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হয়। কিন্তু বিবাহিত মেয়েরা পিতার সম্পত্তির কোন অধিকার পায় না। পিতার মৃত্যুর পূর্বে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রের পুত্রগণ, পুত্র কন্যা কেহই না থাকিলে সম্পত্তি তাহার ভাইদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হইয়া যায়। মাতার সম্পত্তি কন্যারা সমান ভাগে ভাগ পাইয়া থাকে। প্রথমে অবিবাহিত কন্যারা

পরে বিবাহিত কন্যারা অধিকার পাইয়া থাকে। কন্যা না থাকিলে পুত্ররা মাতার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়।

ধর্ম ও অনুষ্ঠান—লেপচাদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক আবার ভূতোপাসক। বেশ কিছু লেপ্‌চা খ্রীষ্টধর্মেও দীক্ষিত হইয়াছে। 'মন বা বুনথিং' হইলেন লেপচাদের নিজস্ব পুরোহিত। নানারকম বৌদ্ধ উৎসব ছাড়াও লেপচারা প্রাচীন মতে কিছু কিছু উৎসব পালন করেন। লেপচাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে ব্যয়বহুল।

স্থায়ী কৃষিজীবী

সাঁওতাল (The Santhal)

সাঁওতালরা ভারতের বৃহত্তম উপজাতির মধ্যে অন্যতম। ১৯৬১-র আদমসুমারীতে ভারতবর্ষে ইহারা সংখ্যায় ছিল ৩,১৫২,৫৪৫ জন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ইহারা সংখ্যায় ১৩,৭৬,৯৮০ জন। সাঁওতালরা কঠোর পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সহজ ও সরল, স্থায়ী সমতলভূমিতে চাষ করিতে ভালবাসে। তাহাদের সহজ সরলতার সুযোগ লইয়া জমিদার, মহাজন এবং তথাকথিত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, সেইজন্য বারে বারে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ তাহারই এক নিদর্শন। সে আগুন এখনও স্তব্ধ হইয়া যায়নি। তাই বর্তমানে 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্য দাবী তাহারই এক নমুনা।

সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষক গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন বোডিং, দত্ত মজুমদার প্রভৃতি।

বাসস্থান—কেউ কেউ মনে করেন সাঁওতাল জাতি উদ্ভূত হইয়াছে একটি সুবৃহৎ দ্রাবিড়গোষ্ঠী হইতে। ভাষার দিক হইতে ইহারা কোলেরিয়ান বা কোলিয়ান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতাল সম্ভবতঃ 'সাওয়ানতার'-এর অপভ্রংশ। এই নামটি ইহারা ব্যবহার করিয়াছিল কয়েক পুরুষ ধরিয়া, এই দেশে বসতি স্থাপনের পর। সাওন্ত বা সামন্তভূমি ছিল প্রাচীন মেদিনীপুর

৯

সংলগ্ন। অনেকের ধারণা এই সামন্তভূমি বা সাওন্ত দেশে দীর্ঘকাল বাস করার জন্যই ইহারা সাওন্তার বা সাঁওতাল বলিয়া পরিচিত।

সাধারণভাবে সাঁওতালদের প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক-দিকে সাঁওতাল পরগণা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সাঁওতাল ও দামোদরের উত্তর তীরের সাঁওতাল। অন্যদিকে বিহারের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী ও উড়িষ্যার উত্তর সীমান্তবর্তী সাঁওতাল এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতাল। উত্তরের সাঁওতালদের বলে 'ভুমকা-হড়' এবং দক্ষিণের সাঁওতালদের বলে 'বগড়িহড়'।

বর্তমানে সাঁওতালদের বেশীর ভাগই সাঁওতাল পরগণাকে কেন্দ্র করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে অর্থাৎ বিহারের সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, পুর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম এবং মুংগের প্রভৃতি জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা এবং মালদা, উত্তর-বঙ্গের চা-বাগান প্রভৃতি অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ও আসামের চা-বাগানের সন্নিহিত অঞ্চলে ইহাদের বসতি। এই সকল অঞ্চল একদিকে ছোটনাগপুর পাহাড়ের রুক্ষ পাথর দিয়া গড়া উচ্চভূমি, অপরদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটি দিয়া গড়া সমতলভূমি। একদিকে শাল মহুয়ার ঘন জঙ্গল অপরদিকে আম, বট, অশ্বত্থ, শিরিসের, বিচ্ছিন্ন শ্যামলিমা। এই সকল অরণ্যে চিতাবাঘ, হরিণ, বন্য বিড়াল, বন্যশূকর, খরগোশ ও নানা প্রকার পাখী হরিয়াল, ঘুঘু, মরাল প্রভৃতির আবাস।

জাতিতত্ত্ব বিচারে সাঁওতালদের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড অথবা প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাদের উচ্চতা বেঁটে আকৃতির, সুগঠিত দেহ। মোটামুটি উচ্চতা ১৫৯·৬ সে. মি. হইতে ১৬১·৪ সে. মি.। গায়ের রং ঘন বাদামী হইতে কালো। চুল ঢেউ খেলান, কখনও কখনও কুঞ্চন চুলও দেখা যায় এবং চুলের রং কালো। নাক চওড়া, নাকের সূচক ৮৮·৮, ঠোঁট মোটা, লম্বা ও সরু মাথা, মুখ চওড়া, কপাল অনুচ্চ। দৈহিক গঠনে মুণ্ডাদের সহিত ইহাদের মিল আছে আবার বোডিং নিগ্রোদের সহিত সাঁওতালদের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ভাষা—সাঁওতালরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী গোষ্ঠী। ইহাদের মাতৃভাষা সাঁওতালী। এই ভাষা মুণ্ডারী ভাষার অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালরা বাংলা অথবা আঞ্চলিক ভাষা বলিতে পারে। বর্তমানে ইহাদের মধ্যে

লিখিত সাহিত্যের প্রচলন হইয়াছে। শিক্ষিত অনেক সাঁওতালী ভাষায় বাংলা হরফে বই লিখিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই সাঁওতালী ভাষায় গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লিখেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় সাঁওতালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। সাঁওতালী কয়েকটি গ্রন্থকে পাঠ্য করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে গালমারাও এবং বর্তমানে 'পছিমবাংলা' নামে সাঁওতালী পত্রিকা প্রচলন করেন। 'সমাজবাদী' 'হাড়িয়ার শাকাম' প্রভৃতি কয়েকটি সাঁওতালী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

পেশা—সাঁওতালরা জীবিকা হিসাবে বনজাত দ্রব্যাদি আহরণ করা পশুপক্ষি ও মৎস্য শিকার এবং চাষ। বর্তমানে সাঁওতালরা বহুলাংশেই কৃষিজীবী। অনেকে দিন মজুর হিসাবেও কাজ করে। আবার শিক্ষিত সাঁওতালরা নানা চাকুরীতে নিযুক্ত আছে।

কৃষিকার্য—সাঁওতালরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ধানই হইল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ধান ছাড়া গম, ভুট্টা. তুলা, ডাল, সরিষা ও নানাপ্রকার শাক-সব্জী হইল প্রধান। ইহারা চাষের জমিকে তিনভাগে ভাগ করে। বাস্তু সংলগ্ন জমিকে 'বার্গে' জমি বলে, এখানে ভুট্টা, বজরা, সরিষা এবং নানা ধরনের শাক-সব্জী চাষ করে। উচ্চ জমিকে 'গডা' বলে। এই জমি বাস্তু হইতে বেশী দূরে নয়। এই জমিতে বজরা, তুলা ও গম উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ধরনের জমিকে 'ক্ষেত' বলে। এই জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ক্ষেত জমিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকে।

(ক) 'চহরম' ক্ষেত যেখানে খুব ভাল ধান উৎপন্ন হয় না।

(খ) 'সোয়েম' অপেক্ষাকৃত নীচু যেখানে মাঝারি ধরনের ধান উৎপন্ন হয়।

(গ) 'সোল' হইতেছে নীচু ও জলা জমি, যাহা ধান উৎপাদনের পক্ষে সবথেকে ভাল জমি। সাঁওতালরা রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করে। লাঙল দ্বারা চাষ করার জন্য বলদ অথবা মহিষ নিযুক্ত করে। প্রথমে জুন-জুলাই মাসে বীজতলা করিয়া বীজ বপন করে। চারা গাছ যখন চার ছয় ইঞ্চি বড় হয় তখন অন্যত্র বড় জমিতে বার বার লাঙল দেওয়ার পর মই দ্বারা

সমতল করিয়া রোপণ করে। জমিতে সার হিসাবে গোবর সার, ছাই ব্যবহার করে। জলকে আটকাইয়া রাখার জন্ম জমির চতুর্দিকে বাঁধ তৈয়ারী করে। কৃষিকার্যের জন্ম পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ে সমানভাবে কৃষি জমিতে কাজ করে। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের লাঙল করা নিষেধ থাকে। কারণ ইহা তাহাদের ধর্মীয় বাধা। তাহাছাড়া রোপণ, নিড়ান, শস্ত কাটা, ঝাড়াই করা শস্ত কুটা প্রভৃতি সকল কাজেই স্ত্রী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।

শিকার—শিকার এককালে সাঁওতালদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। গ্রামের পথে পথে এখনও সাঁওতালদের তীর-ধনুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। নানা রকমের পক্ষী, কাঠবিড়াল, খরগোশ, বন্য শূকর হইল প্রধান শিকারের বস্তু। সময় সময় দল বাঁধিয়া শিকারে বাহির হয়। আবার বৎসরের এক সময়, সাধারণতঃ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) মাসে শিকারের অভিযানে বাহির হয় এবং তিন-চারদিন ধরিয়া শিকার চলিতে থাকে। এই অনুষ্ঠানে শিকারের পূজারী 'দেহরী' উপস্থিত থাকেন। তিনিই 'গিরা' চালাইয়া পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামকে জানাইয়া দেন। গিরা পদ্ধতি হইতেছে খপরের প্রতীক অর্থাৎ একটি শাল গাছের ছালকে গাঁট দিয়া তারিখ ও সময় দিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে চালাইয়া দেয়। তখন সকলে সেইদিনে শিকার অভিযানে বাহির হয়। শিকারের বস্তু লইয়া তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ হয় না। যে প্রথমে শিকারকে বিদ্ধ করে সেই শিকারের মালিক হয়। অনেক সময় যৌথভাবে বণ্টন হয়। মৎস্য শিকারে বিশেষ পারদর্শী নয় তথাপি তাহারা পুকুরে, নদীতে, ঝর্নাতে ও জলাশয়ে মৎস্য শিকার করে। মৎস্য ধরিবার জন্য জাল, ও একরকমের ঘূণি পোলো জাতীয় খাঁচা ব্যবহার করে। বঁড়শীতে মাছ ধরাও তাহাদের নিকট নূতন নয়। ময়ূরভঞ্জের সাঁওতালদের তীর ধনুক দ্বারা মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়।

খাদ্য সংগ্রহ—বিশেষ করিয়া যে সকল সাঁওতাল জঙ্গলের কিনারে বাস করে তাহারা খাদ্য সংগ্রহের উপর অনেকটা নির্ভর করে। খাদ্য সংগ্রহ বলিতে বুঝায় নানা ধরনের গাছ, ফল, ফুল, মূল এবং কাণ্ড; মহুয়া ফুল সংগ্রহ, শালপাতা, কেঁদ পাতা সংগ্রহ হইতেছে প্রধান। শালপাতা ও বিড়িপাতা বাজারে বিক্রয় করে ও মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করে। অনেক সময় নিমফল সংগ্রহ করে তাহা হইতে তেল তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে।

মজুর—সাঁওতালরা কৃষি মজুর ও শিল্প মজুর দুইরকম ভাবেই কাজ করে। নিজেদের আশেপাশে কৃষিজমিতে কাজ ব্যতিত তাহারা সাধারণ কৃষক—শ্রমিক হিসাবে নগদ মজুরীতে 'নামাল' খাটিতে যায়। অর্থাৎ বৎসরের যে সময়ে ধান রোপণ এবং কাটা হয়, ঐ সময় নগদ মজুরীতে কাজ করিবার জন্য আসে। কাজ শেষ হইলে আবার ফিরিয়া যায়। তাহাছাড়া স্থায়ীভাবে স্থানীয় জোতদারের বাড়ীতে নগদ মজুরীতে কাজ করে। অনেক সময় কুলি হিসাবে রেল স্টেশনে কাজ করিয়া থাকে এবং বড় বড় ভারী শিল্পে চা-বাগানের শ্রমিক হিসাবেও কাজ করে। সুতরাং মজুর হিসাবে কাজ করিয়া অনেক সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

বর্তমানে সাঁওতালদের অনেকেই শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারা অফিস আদালতে, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকুরী, পুলিস, সৈন্যবিভাগে চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—কৃষি বিষয়ক যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান হইল 'নাহেল' অর্থাৎ লাঙল। ইহার হাতের ধরিবার অংশকে বোঁটা বলে। ইহা কোণাকৃতি একটি কাঠের সহিত সংযুক্ত। যে অংশে কোণ করিয়াছে সেখান হইতে প্রান্তদেশ চওড়া হইয়া গিয়াছে ইহাকে 'ঈশ' বলে। ইহার সহিত লোহার তৈয়ারী ফলা সংযুক্ত। ফলার সহিত বোঁটা ১৩০° কোণ করিয়া তৈয়ারী থাকে। লাঙলের সাহায্যে মাটি কর্ষণ করে। জোয়াল কাঠের তৈয়ারী চওড়া পাটা ও মাঝে খাঁজ কাটা থাকে। 'খারহা' অর্থাৎ মই দ্বারা জমি সমান করে। 'কুদি' অর্থাৎ কোদাল দ্বারা মাটি কুপায়। ইহার হাতল গোলাকার ও ফলা হইতেছে চওড়া লোহার পাত। পাতের সহিত হাতলের ৯০° কম কোণ করিয়া থাকে। মুগুর মাটি গুঁড়া করিতে ব্যবহার করে। ইহাও কাঠের তৈয়ারী। ধান কাটার জন্য কাস্তে ব্যবহার করে। ইহার দুইটি অংশ হাতল ও চওড়া অর্ধগোলাকৃতি লোহার অংশ, কার্যকরী অংশে খাঁজ বা দাঁত বর্তমান। দা এর দুইটি অংশ কাঠের তৈয়ারী হাতল অন্যটি লোহার তৈয়ারী চওড়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফলা। ইহার এক ধার ধারাল অপর ধার অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভোঁতা। 'উখর' বা উদূখল এবং ঢেঁকি দ্বারা শস্য কুটার কাজ করে। 'হাটাক' বা কুলো হইতেছে বাঁশের তৈয়ারী। ইহার দ্বারা বাতাস দিয়া ধুলা বালি হইতে চাল ও শস্যকে পৃথক করে। কৃষিকার্যের জন্য নানা যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। অনেক গ্রামে চাপ দিয়া তেল তৈয়ারী

করিবার জন্য ঘানি অথবা মানুষটানা কাঠের ঘানি দেখিতে পাওয়া যায়। শিকারের জন্য তীর ধনুকই হইল প্রধান। তাহাছাড়া বাটুল (pellet) বর্শা বা সড়কি ব্যবহার করে। বাঁশের বাঁখারি দিয়া ধনুক তৈয়ারী করিয়া থাকে। বাঁশের ছিলকাই গুণের কাজ করে। তীরের ফলক হইল লোহার ও দণ্ড বাঁশের কঞ্চির তৈয়ারী। দণ্ডের এক প্রান্তে খাঁজ থাকে ও তাহার উপরে পালক বাঁধা থাকে ইহাতে তীর খুব দ্রুত ও সোজা ছুটিতে পারে। কখনও ফাঁদ পাতিয়া নানারকম পাখি ধরে। ইহা ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহের জন্য, দূরপাল্লার যাত্রায় তাহারা এক রকমের লম্বা হাতল বিশিষ্ট টাঙি (battle axe) ব্যবহার করে। মৎস্য শিকারের জন্য ছাঁকনি জাল, খেপলা জাল, দু-একরকমের ঘুণি, পোলো জাতীয় খাঁচা ব্যবহার করে।

গৃহপালিত পশু—গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাঁস, মুরগী হইল প্রধান। গরু বা মহিষের দুগ্ধ পান করিতে ইহারা অভ্যস্ত। গাড়ীটানা, লাঙলকরা ইত্যাদি কাজে গরু বা মহিষ নিযুক্ত করে। শিকারের সময় কুকুর অত্যন্ত সাহায্য করিয়া থাকে। মুরগী ও শূকরের মাংস তাহারা খায় এবং দেবদেবী ও ভূতপ্রেতকে শান্ত করিবার জন্যও উৎসর্গ করে।

খাদ্য—সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, ইহাকে 'দাকা' বলে। ইহারা দিনে দুইবার ভাত খায়। সকালে পান্তা ভাত খায় যাহা সারা রাত্রি জলে ভিজান থাকে। পান্তা ভাত খাইয়া কাজে বাহির হয়। ইহার সহিত লঙ্কা, শাক ভাজা খাইয়া থাকে। সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গরম ভাত রান্না করিয়া খায়। ইহার সহিত মাছ, মাংস তরিতরকারী খায়।

সাঁওতালরা দুই ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে। ভাতকে পচাইয়া হাঁড়িয়া তৈয়ারী করিয়া খাওয়া তাহাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় ধরনের হইতেছে মহুয়া ফুল হইতে পাওয়া অর্থাৎ মদ তৈয়ারী করিয়া খাওয়া। তামাক শালপাতাতে পাকাইয়া চুটার ধোঁয়া পান করে। বর্তমানে বিড়ি সিগারেট খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আগুন জ্বালান পদ্ধতি—কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত। ইহাদের মধ্যে চকমকির সাহায্যে আগুন জ্বালানর ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমানে

দেশলাই লাইটার ব্যবহার করিয়া থাকে। দূরপাল্লায় যাওয়ার জন্য টর্চ ব্যবহার করে। শীতের ভোরে আগুন জ্বালাইয়া শীত নিবারণ করে।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—সাঁওতালদের ঘরগুলি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাহারা জঙ্গলের অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে নিজেদের বসতবাড়ী তৈয়ারী করে। গ্রামগুলি লম্বা আকৃতির অর্থাৎ মাঝখানের রাস্তার দুইদিকে ঘরগুলি অবস্থিত। আবার কোন কোন গ্রামের ঘরগুলি বিক্ষিপ্ত। গ্রামের প্রবেশ মুখে শাল কাঠের একটি পবিত্র স্থান থাকে ইহাকে বলে 'যাহের থান' গ্রামের প্রধান রাস্তার নিকটে প্রধান মাতব্বরের বাড়ী। তাহার নিকট থাকে 'মাঝি থান' ইহাই হইতেছে গ্রাম পত্তনকারী প্রথম প্রধানের আত্মার স্থান। বর্তমানে সাঁওতাল গ্রামে কূপ ইঁদারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয় ও ক্লাব ঘর চোখে পড়ে।

ঘরগুলি সাধারণতঃ ১৪ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট প্রশস্ত ও আট ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঘরগুলি মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট কখনও বা গাছের ডালকে দাঁড় করাইয়া বেড়া তৈয়ারী করে। তারপর গোবর ও মাটির প্রলেপ দেয়। ঘরগুলির চাল ঢালুভাবে আয়তাকৃতি বাঁশ বা গাছের ডালকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠামো তৈয়ারী করে। তারপর সাবুই ঘাস অথবা খড় দ্বারা ছাউনি দেয়। ঘরগুলি দো-চালা অথবা চার-চালা হইয়া থাকে। ঘরগুলির দুইটি ভাগ একটিতে শয়ন ঘর অপরটিতে সংসারের জিনিস-পত্র রাখা হয়। ঘরের চতুর্দিকে শাক-সব্জী উৎপাদনের জন্য জায়গা থাকে। কখনও বা গরু, মহিষ, শূকর থাকিবার জন্য ঘর থাকে।

ঘরগুলির দেওয়াল পরিষ্কারভাবে গোবর মাটি দ্বারা প্রলেপ দেওয়া থাকে। তার উপরে লাল, সাদা, কালো মাটির আবরণ থাকে। অনেক সময় নানা রঙের মাটি দ্বারা নানা ছবি অঙ্কন করিয়া রাখে। দাওয়া উঠান হইতে বেশ কিছুটা উঁচু। তাহাও আবার কালো রঙের। সাঁওতাল ঘরগুলি অত্যন্ত সুন্দর দেখায় এবং তাহারা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে।

আসবাবপত্র—প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একটি করিয়া খাটিয়া থাকে। ইহা আয়তাকৃতি কাঠের বা বাঁশের এবং সাবুই দড়ি দিয়া বুনন করা থাকে। রান্না করার জন্য মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করে। খাওয়ার জন্য শালপাতা বা কাঁসা, এ্যালুমিনিয়ামের থালা বাটি ব্যবহার করে। প্রত্যেক পরিবারে একটি

কাঁসার 'জামবাটী' অবশ্যই থাকে। জলবহন ও মজুত রাখার জন্য মাটির হাঁড়িই ব্যবহার করে। খাদ্যশস্য রাখার জন্য গোবরের প্রলেপ দেওয়া বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করে। ইহাকে 'গাউনি' বলে। কাপড়চোপড়, অলঙ্কার রাখার জন্য বাঁশেরই ঢাকনা দেওয়া 'প্যাটরা' ব্যবহার করে। ভার বহনের জন্য একটি করিয়া বাঁক থাকে। বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচার জন্য 'খুনুণ্ড' অর্থাৎ টোকা ব্যবহার করে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—জঙ্গলের কিনারে যে সকল সাঁওতাল বাস করে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন আভিজাত্য নাই। পুরুষেরা গামছা বা 'কৌপীন' জাতীয় ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। মেয়েরা মোটা শাড়ী ব্যবহার করে। ইহাকে তাহারা 'পাঁড় হাড়' বলে। একখণ্ড কোমরে জড়ান অপর খণ্ড বুকের উপর দিয়া পিঠের দিকে ফেলানো অবস্থায় থাকে। বর্তমানে ধুতি শাড়ী ও নানাবিধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। যুবকরা প্যাণ্ট সার্ট গেঞ্জী পরিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা রংবেরং-এর শাড়ী, শায়া, ব্লাউজ পরিধান করে। মেয়েদের শাড়ী পরিধানে এক বিশেষ বৈচিত্র্য বহন করে।

সাঁওতাল মেয়েরা নানা ধরনের অলঙ্কার পরিতে পছন্দ করে। প্রত্যেক যুবতী সাঁওতাল গলায় রূপার তৈয়ারী হাঁসুলি পরিধান করে। তাহাছাড়া পিতলের তৈয়ারী ভারী ভারী অলঙ্কার যেমন পায়ে মল, আর্মলেট, রূপার মাথার ফুল, কানে রিং, হাতে বালা পরিধান করে। পুঁতির তৈয়ারী মালা পরিধান করিতেও পছন্দ করে। কখনও বা তাহারা সারা দেহে উল্কি আঁকিয়া নিজেদিগকে সজ্জিত করে। বিশেষ করিয়া বুকে পিঠে নানাধরনের ফুল, মাছ, পাখী আঁকিয়া রাখে।

চুলের সৌন্দর্য—চুলের পরিচর্যাতে সাঁওতাল মেয়েরা খুব বেশী আগ্রহী। চুলে নারিকেল তেল দিয়া চিরুনি দ্বারা আঁচড়াইয়া খোঁপা তৈয়ারী করে এবং খোঁপায় ফুল আটকাইয়া রাখা ইহাদের আর এক বৈশিষ্ট্য। পুরুষেরা চুল কাটে এবং স্নান করার পর চিরুনি দ্বারা আঁচড়ায়। দাড়ি গোঁফ কাটিয়া পরিষ্কার রাখে।

হস্তশিল্প—সাঁওতাল মেয়েরা হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শী। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের ঘরগুলির দেওয়ালগুলি হইতে। দেওয়ালে নানা রঙ দিয়া চিত্রিত বিচিত্র করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই নাচ

গানে বিশেষ আসক্ত। নাচ আর গানে সকল সময় নিজেদিগকে মুখরিত করিয়া রাখে। মাদল বা ধামশা তাহাদের জাতিগত বাদ্যযন্ত্র। গানের বাদ্যযন্ত্র হইতেছে বাঁশের তৈয়ারী বড় বড় বাঁশি আবার মহিষের শিং হইতেও বাঁশি তৈয়ারী করে।

সাঁওতাল পুরুষেরা কাঠের কাজ করিতেও উপযুক্ত। তাহাছাড়া মহুয়া ফল হইতে ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করিতে পারে। সুতরাং সাঁওতাল কি পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েই হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শী।

সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম—সহজ সরল, কৃষিগোষ্ঠী মানুষ সাঁওতালদের সামাজিক গঠন বৈচিত্র্যময়। সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' বলিয়া পরিচয় দেয়। সমগ্র সাঁওতাল সমাজটি কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত।

গোত্র—ইহারা গোত্রকে 'পারি' বলে। ইহাদের সমাজ ১২টি গোত্রে বিভক্ত। বর্তমানে এগারটি গোত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। দ্বাদশ গোত্রটি লোপ পাইয়াছে। গোত্রগুলি বহির্বিবাহ সংস্থা অর্থাৎ স্বগোত্রে বিবাহ হয় না।

গোত্রগুলি পিতৃকেন্দ্রিক অর্থাৎ পুত্ররা পিতার গোত্র পাইয়া থাকে। সাঁওতালদের ধারণা পিলুকী হারাম, পিলুকীবুড়ি এই দুইজন হইল সম্প্রদায়ের স্রষ্টা, তাহারা পারস্পরিক বিবাহে আবদ্ধ হইলে তাহাদের আবার সাতজন করিয়া পুত্র কন্যা হয়। সেই পূর্বপুরুষদের নাম ও গোত্র লইয়া সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, পরে একই গোত্রে বিবাহ বাদ দেওয়া হয়। ইহাই তাহাদের সমাজের রূপকথা। সেই সাতটি গোত্র হইল (১) হাঁসদা (২) মুরমু (৩) কিসকু (৪) হেমব্রম (৫) মাণ্ডি (৬) সরেন (৭) টুডু। এইগুলি তাহাদের পদবী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সাতটি গোত্রের সহিত আরও পাঁচটি গোত্র দেখা যায় তাহারা হইল (৮) বাস্‌কে (৯) পাউড়িয়া (১০) বেসরা (১১) চাঁড়ে (১২) বড়য়া। প্রত্যেক গোত্র বা কুলের একটি করিয়া গোত্র দেবতা থাকে। যেমন হাঁসদা গোত্রের লোকেরা হাঁসপাখী মারে না বা খায় না। মুর্মু গোত্রের লোকেরা কখনও চাঁপাফুল স্পর্শ করে না। মাণ্ডি গোত্রের লোকেরা একজাতীয় ঘাসকে কাটিবার সময় নমস্কার করে। পাউড়িয়া গোত্রের লোকেরা পায়রাকে মারে না বা খায় না। চাঁড়ে গোত্রের লোকেরা গিরগিটিকে মারে না। তাহাছাড়া গোত্রগুলির আবার মৌলিক বৃত্তি ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যেমন সরেন গোত্রের লোকেরা সৈনিকের কাজ করিত। টুডু

গোত্রের লোকজন লোহার জিনিসপত্র তৈয়ারী করিত। বাস্কে গোত্রের লোকেরা বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করিত। মুর্মু গোত্রের লোকেরা পূজা-পদ্ধতিতে পুরোহিতের কাজ করিত। বেস্‌রা গোত্র কোন অপক্রিয়া হইতে আসিয়াছে। গোত্রগুলির মধ্যে বেস্‌রা এবং চাঁড়ে অপেক্ষাকৃত নীচু।

উপ-গোত্র—গোত্রগুলি উপ-গোত্রে বিভক্ত। ইহারা উপ-গোত্রকে খুট্ বলে। খুট্ এর সংখ্যা বিভিন্ন পারিতে বিভিন্ন ধরনের। ক্যাম্বেল এর মতে ইহাদের সংখ্যা ১৩ হইতে ২৮টি পর্যন্ত হইয়া থাকে। ১১টি গোত্রে মোট ২০৮টি উপ-গোত্র বর্তমান। খুট এর প্রধান কাজ পারিবারিক পূজা-অর্চনা সংযত করা অর্থাৎ একই খুট্ এর লোক ছাড়া সেই খুট্-এর পূজাতে অংশগ্রহণ করিতে পারে না, তাহাছাড়া যদিও কোন সময় স্ব-গোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে কিন্তু স্ব-উপগোত্রে বিবাহ করা অত্যন্ত সামাজিক অপরাধ। উপ-গোত্রগুলি পরিবারে বিভক্ত।

পরিবার—সাঁওতালদের সমাজে পরিবার হইল ক্ষুদ্রতম সংস্থা। পিতা মাতা সন্তান-সন্ততিদের লইয়া পরিবার। আবার অনেক সময় বহু পত্নী লইয়া একান্নবর্তী পরিবারও দেখা যায়। অর্থাৎ পিতামাতা তাহাদের বিবাহিত পুত্র লইয়া পরিবার গঠিত হয়। কৃষিসমাজ বলিয়া একান্নবর্তী পরিবার থাকা স্বাভাবিক। ইহাদের পিতৃ-কেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে পিতার কর্তৃত্ব দেখা যায় ও বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে আসিয়া বসবাস করে। অনেক সময় 'ঘরদি-যাওয়া' অর্থাৎ ঘর-জামাই স্ত্রীর পিতার গৃহে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বিষয় সম্পত্তির মালিক হয় পুরুষেরা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা মালিক হইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে শ্রমের বিভাজন দেখা যায়। পুরুষেরা শিকার, মৎস্য শিকার, কৃষিকার্য, ঘরবাড়ী তৈয়ারী ও অন্যান্য বাহিরের কাজ করে; মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া কৃষিকার্যের কাজ করে। ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাতা পিতাকে কাজে সহায়তা করে এবং শিশু ভাইবোনেদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

আত্মীয়তা সম্বন্ধ—শ্রেণীগত সম্বন্ধ সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত। বাবা, কাকা একই নাম 'আপাম' বলিয়া ডাকে। বর্ণনামূলকও দেখা যায়, হাপেন ছোটদের ক্ষেত্রে এবং গংপো বড়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। মামিমা কাকীমা-দের 'আইয়ো' বলিয়া ডাকে।

জীবন চক্র—সাঁওতালদের জীবনচক্র চারিটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। যেমন 'জনম চাতির' বা জন্ম অনুষ্ঠান, 'কাকো চাতির' বা সামাজিক স্বীকৃতি, বিবাহ এবং মৃত্যু। এই সকল অনুষ্ঠান পুরুষানুক্রমিক ভাবে চালিত হইয়া আসিতেছে ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই।

জন্ম—সন্তান ভুমিষ্ঠ হইবার পর তীর দিয়া তাহার নাভিচ্ছেদ করা হয়। 'জানান ছাতিয়া' অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত জন্ম অশৌচ থাকে। তিন-দিন পর মাথা মুণ্ডন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গ্রামের সমস্ত লোক ঐ বাড়ীতে আসে। গৃহস্বামী উপস্থিত গ্রামবাসীকে তেল-হলুদ দিয়া স্নান করায়। ঐ সময় মেয়েদের নখকাটা ও পুরুষদের নখ চুল কাটে। যে তীর দিয়া নাভিচ্ছেদ করা হইয়াছিল সেই তীর, মাথার চুল ও সুতা জলে ভাসাইয়া দেয়। পরে ঐ সুতা শিশুর কোমরে বাঁধিয়া দেয়। ইহার পর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়।

শিশুর জন্ম হওয়ার পর তাহার প্রথম নামকরণ হইয়া থাকে, ছেলের জন্মের পাঁচদিন পর এবং মেয়ের জন্মের তিনদিন পর। যদি পুর্ণিমা তিথির তিনদিন পূর্বে জন্ম হয় তাহা হইলে এই অনুষ্ঠান ঠিক পুর্ণিমার তিনদিন পুর্বেই অনুষ্ঠিত হয়। যদি পুর্ণিমার তিথির পর জন্ম হয় তাহা হইলে পরবর্তী মাসে অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। জনম চাতির অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্যায়ে শেষ হয়। প্রথমতঃ ঘরবাড়ী পরিষ্কার এবং পবিত্র করা দ্বিতীয়তঃ গ্রামকে অশুদ্ধ হইতে মুক্ত করা, শিশুকে পিতার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাহাতে পিতার মর্যাদা পায়। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগতভাবে নাম দেওয়া।

প্রায় প্রত্যেক সাঁওতালের দুইটি করিয়া নাম থাকে। একটি হইতেছে 'মূল' অর্থাৎ প্রকৃত নাম এবং দ্বিতীয় 'ভান' অর্থাৎ ডাক নাম। মূল নাম দেওয়ার পর ধাত্রীমাতা গ্রাম্য ব্যক্তি ও পুরোহিতকে নমস্কার জানায়।

কাকো চাতির অনুষ্ঠান দ্বারা সে সমাজের একজন পূর্ণাঙ্গ সভ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সে সামাজিক স্বীকৃতি ও অধিকার পাইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠান মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় না কারণ সমাজের মধ্যে সে রকম কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না বা তাহাকে কোন সাধারণ পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

বিবাহ—এক বিবাহ সমাজের মধ্যে প্রচলিত। যদিও বহুপত্নীমূলক বিবাহ সমাজের মধ্যে একেবারে অস্বাভাবিক নয়। সাধারণতঃ পরিণত

বয়সে বিবাহ সাঁওতাল সমাজের একটি সংস্কার। আঠার হইতে বাইশ বৎসর বয়স হইলে পিতামাতা তাহার পুত্রের জন্য কন্যা ঠিক করিতে থাকে। আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় হিন্দুদের মত কম বয়সেও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকে। দেবরণ এবং শালাবরণ বিবাহ প্রচলিত কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে কোনদিন বিবাহ করে না।

সাঁওতালদের বিবাহের ধরনকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) **কিরিং বাহু বাপ্‌লা**—এই বিবাহে বর কন্যার অভিভাবকগণ পরস্পরের বাড়ী গিয়া পছন্দ করিয়া আসে। যোগাযোগ করার জন্য এ কজন মাধ্যম বা রাইবর বাপ্‌লা থাকে। প্রথমে যগ্‌মাঝি বা গ্রাম মাতব্বর বরের সহিত কন্যার বাড়ীতে যায় এবং যদি কন্যা এবং কন্যার বাড়ীর আচরণে সন্তুষ্ট হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যা 'বাগদত্তা' হয়। সেই সময় কন্যাকে কোলে বসাইতে হয় এবং বরের কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি হাঁসুলি উপহার হিসাবে দেয়। একইভাবে কন্যার পিতাও বরের বাড়ীতে গিয়া ধুতি এবং কিছু টাকা আশীর্বাদী হিসাবে দেয়। বিবাহের দিন বরকে কন্যাপণ মিটাইয়া দিতে হয়।

(২) **টুঙ্কি দীপিল**—বিবাহের পূর্বে পাকা দেখা ও আশীর্বাদ সবই একই প্রকার। ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান কন্যার বাড়ীতে হয় না। কন্যাপণ ইত্যাদি সমূহ মিটাইয়া দেওয়ার পর গ্রামের লোকজন ও যগ্‌মাঝি কন্যাকে আনিতে যায় এবং বরের বাড়ীতে অনুষ্ঠান হয়।

(৩) **টুঙ্কি দীপিল বাপ্‌লা**—যাহারা বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচ বহন করিতে পারে না তাহারাই এই ধরনের বিবাহ করিয়া থাকে। এ স্থলে কন্যা তাহার যাহা কিছু সম্বল তাহাই একটি ঝুড়িতে করিয়া বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং পাত্র তাহার মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দেয় এইভাবে বিবাহ সমাধা হয়।

(৪) **ইতুৎ বাপ্‌লা**—ইতুৎ কথার অর্থ হইতেছে কপালে সিন্দুর দেওয়া। এইভাবে বর এবং কন্যা উভয়েই পরস্পরকে ভালবাসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। বরের কর্তৃপক্ষ রাজী থাকে কিন্তু কন্যার কর্তৃপক্ষ রাজী থাকে না। বর কন্যার মাথায় হঠাৎ একদিন সিন্দুর পরাইয়া দেয়। ইহার পর যগ্‌মাঝি ঘটনাটি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে এবং নিষ্পত্তি করে। বরের

কর্তৃপক্ষ দুইটি ভাল পাঁঠা অথবা শূকর দিয়া গ্রামে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করে। কন্যা তাহার পণ টাকা পায় এবং গ্রামের মাতব্বররা সম্মানস্বরূপ পাঁচ টাকা পাইয়া থাকে।

(৫) **নিরবোলোক বাপ্‌লা**—নিরবোলক কথাটির অর্থ হইতেছে 'পলাইয়া যাওয়া'। প্রথমতঃ কোন মেয়ে যদি কোন ছেলের প্রতি আসক্ত হয় এমনকি যদি অবৈধভাবে অন্তঃস্বত্বা হইয়া পড়ে কিন্তু পরে ঐ ছেলে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে অথবা তাহাদের অভিভাবকদের আপত্তি থাকে, তখন মেয়েটি যগ্‌মাঝির নিকট সমূহ বৃত্তান্ত জানায় এবং তাহার সহযোগিতায় ছেলেটির বাড়ী যায় এবং তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নানা নির্যাতন ভোগ করে। অবশেষে যগ্‌মাঝি ও অন্যান্যদের চাপে স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই বিবাহের সমূহ খরচ বরপক্ষকে দিতে হয়।

(৬) **কিরিং যাওয়াল**—কোন কারণে অনূঢ়া কন্যা গর্ভবতী হইলে তাহার জন্য একটি পাত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। যে যুবকের দ্বারা গর্ভবতী হইয়া পড়ে সে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তখন পাত্র সংগ্রহ করিতে হয়। যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে কোন কোন পাত্র তাহাতে রাজি হয়। ইহার সমস্ত ব্যয় সেই ব্যক্তিকে করিতে হয়। যদি কোন পাত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী সন্তান যগ্‌মাঝির গোত্র ও কুল পাইয়া থাকে।

(৭) **ঘরদি-যাওয়াল**—এই বিবাহে পাত্রকে কোন কন্যাপণ দিতে হয় না। পাত্র এই স্থলে ভাবী স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাস করার জন্য আসে। সে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে কয়েক বৎসর থাকিলে শ্বশুর তাহাকে উপঢৌকন ও তৈজসপত্র দিয়া থাকে। কন্যা কুৎসিত দেখিতে হইলে এই বিবাহ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় কন্যাকে সকলে পছন্দ করে না।

(৮) **সাঙা বাপ্‌লা**—বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সহিত বিবাহ করাকে সাঙা বিবাহ বলে। এই স্থলে কন্যাপণ কম দিতে হয়।

বিবাহবিচ্ছেদ—সাঁওতালদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দুইটি প্রধান কারণ গণ্য করা হয়। প্রথমতঃ স্ত্রী যদি বিশ্বাসঘাতিনী অথবা ডাইনী হয় তাহা হইলে সাঁওতাল সমাজে এই রকম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান আছে। পূর্বের দিনে গ্রামের মাতব্বরদের উপস্থিতিতে একটি শাল-পাতাকে ছিন্ন করিয়া বিচ্ছেদ ঘটিত। যদি কোন পুরুষ বিনা কারণে

তাহার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে তাহা হইলে তাহার পণ ফিরিয়া পায় না। সন্তানগুলির ভার পিতার নিকটই থাকিয়া যায়। শিশু সন্তানটি তাহার মাতার নিকট থাকে। যদি বিবাহবিচ্ছেদে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে স্বামী তাহার পণটাকা ফেরত পাইবার দাবী করে।

মৃত্যু—কেবলমাত্র গর্ভবতী এবং শিশু ছাড়া সাঁওতাল সমাজে দাহ করা প্রচলিত রীতি। মৃতব্যক্তিকে খাটিয়া করিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন বহন করে। সাধারণতঃ জলাশয়ের ধারে অথবা নদীধারে মৃতের সৎকার করিয়া থাকে। শবযাত্রার পথে অশরীরী আত্মা হইতে রক্ষার জন্য রাস্তার চৌমাথায় চিঁড়া এবং তুলাবীজ ছড়াইয়া দেয়। মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নির পূর্বে জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার মৃত পিতার মুখে একখণ্ড ঘাস এবং হাতে একটি রূপোর টাকা দেয়। তারপর তাহাকে কাঠের উপর শায়িত করে এবং তাহার কণ্ঠাস্থির একখণ্ড কাটিয়া নূতন মাটির পাত্রে রাখে। শবদাহের পূর্বে চিতার সঙ্গে একটি মুরগী বাচ্চা বাঁধিয়া দেয়। তাহাদের ধারণা ঐ বাচ্চাটি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়। মৃতদেহ সৎকারের পূর্বে তাহাকে নূতন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহার মুখ হাত পা ইত্যাদি ধুয়াইয়া দেয় ও মাথায় তেল হলুদ মাখাইয়া দেয় এবং সধবার ক্ষেত্রে মাথায় সিন্দুর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি প্রজ্বলিত কাঠকে লইয়া মৃতের মুখে দেয়। তখন সকলে মিলিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। দাহ শেষ হইলে মাটির ভাঁড়ে করিয়া দগ্ধাস্থি নদীতে ভাসাইয়া দেয়। ঐ ভাঁড়ের মুখে চাপা থাকে এবং তলদেশে একটি ছিদ্র থাকে তাহাদের ধারণা ঐ ছিদ্র পথে মৃতের আত্মা যাতায়াত করিতে পারিবে। দাহ শেষ হইলে সকলে মিলিয়া পুকুরে বা নদীতে স্নান করে। তারপর একত্রে বসিয়া হাঁড়িয়া পান করে। পুনরায় মৃতের গৃহে ফিরিয়া আসে ও যে স্থলে মারা গিয়াছে সেখানে ঘরের চালে একগোছা নিমপাতা ঝুলাইয়া রাখে।

মৃত্যুর ছয়দিন পরে 'তেলনাহান' অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন তেল, খইল, দাতন প্রভৃতি উৎসর্গ করা হয়। মারাং বুরু, পুরুধুল প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও নিবেদন করা হয়। ঐ সময় মুরগী বলি ও হাঁড়িয়া পূজা হয়। স্থানীয় নদীতে বা দামোদর নদীতে সেই কণ্ঠাস্থি উৎসর্গ করে এবং মৃত আত্মাকে প্রণাম জানায়। তাহাকে স্বর্গে দেবতার নিকট স্থান করিয়া

লইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আদি পিতা পিলকু হাড়াম ও আদিমাতা পিলকু বুড়ীর নিকট প্রার্থনা জানায়। ইহার পর বড় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। মৃত্যুর স্থানে একটি ছাগলকে বলি দেয় এবং ছাগলের রক্ত দিয়া আতপ চাউলকে মিশ্রিত করে ও পরিবারের সকলে ভক্ষণ করে। ঐ দিন সকল আত্মীয়-স্বজন মিলিয়া ভোজন করে এবং অশৌচ ক্রিয়া শেষ হয়।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার—চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত জমি গ্রামের সম্পত্তি। চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও থাকে। পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে ঘরবাড়ী, গৃহস্থের আসবাবপত্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। পুত্ররা পৃথক হইয়া গেলে সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হইয়া যায়। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি গবাদি পশু ও একটি টাকা বেশী পাইয়া থাকে। কন্যারা সম্পত্তির অধিকার পায় না। পুত্রের অবর্তমানে মৃতের ভাইরা সম্পত্তি পায়। অপুত্রক বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হইতে পারে।

গ্রাম সংগঠন—সাঁওতালদের গ্রাম সংগঠন হইতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। সাঁওতালদের সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোরভাবে মানিতে হয়। কেহ অসামাজিক আচরণ করিলে অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত পর্যন্ত করা হয়। ইহাকে তাহাদের 'বীটলাহা' বলে।

সাঁওতালদের শাসনতন্ত্র হইল পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত সংস্থার কার্যনির্বাহক কমিটি সাত জন দ্বারা গঠিত।

(১) মাঝি—গ্রামের প্রধান।

(২) পরানিক—সহকারী প্রধান।

(৩) নায়েক—গ্রামের পূজারী।

(৪) কুদাম—নায়েক-প্রকৃতি পূজারী অর্থাৎ বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী পূজারী।

(৫) যগ্ মাঝি—গ্রাম্য ভোজের আয়োজনকারী এবং গ্রামের যুবকদের নৈতিক চরিত্র বলিষ্ঠকারী।

(৬) যগ্ পারানিক—পারানিকের সহকারী

(৭) গোডেৎ—পঞ্চায়েতের পক্ষে বার্তাবাহক।

গ্রাম পত্তনের পরই এই কার্য নির্বাহক কমিটি নির্বাচিত হয়। ইহার পর বংশানুক্রমিক ভাবে ক্ষমতা ও অবস্থান স্থানান্তরিত হয়। বিচারের স্থান হিসাবে গ্রামের মধ্যস্থলে বৃক্ষতল অথবা গ্রাম দেবতার থান অথবা মাঁঝির স্থান মনোনয়ন হইয়া থাকে। মাঝির মৃত্যু হইলে অস্থায়ী পারানিক মাঝির স্থান পায় এবং গোড়েৎ পারানিকের স্থান পায়।

গ্রামের মধ্যে মাঝির দ্বারা সমস্যা সমাধান না হইলে ইহা বৃহত্তর সংগঠন পরগনার মধ্যে উপস্থাপিত হয়। দশ-বারখানা গ্রাম এই পরগনার অন্তর্ভুক্ত। পরগনার যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি হইতেছেন 'পরগনাইত'। পরগনাইতের সহকারীর নাম 'দেশ-মাঝি'। পরগনাইতের নিকট বিভিন্ন গ্রামের নানা সুখ সুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা আলোচিত হয়। এই আলোচনার সময় প্রত্যেক গ্রামের মাঝি বা প্রধানগণ সমবেত থাকে। 'শিকার-পরিষদ' বা 'লোবির সেন্দ্রা' বা 'সেন্দ্রা দুরুপ'। বৎসরের শিকার অভিযানের সময় এই সভা বসে। এই সভার প্রধান আহ্বায়ক বা সভাপতি হইল 'দেহরী'। যে কোন গ্রাম্য বিবাদের সর্বশেষ বিচার হয় এইখানে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের রায়ও এই বিচারে বদলাইয়া যাইতে পারে। জনগণই এইখানে বিচারের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সর্বশেষ বিচার 'বিটলাহা'। বিটলাহা হইতেছে ঘোরতর অপরাধীর চরম শাস্তি। ইহার দ্বারা সমবেতভাবে গালাগালি, অশ্লীল নৃত্যভঙ্গী আর তার সঙ্গে অপরাধীর ঘর পোড়ানো, গরু, মহিষ, হাঁস মুরগী তাড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি সকলই হইল বিবেচনার অন্তর্গত। সাঁওতালদের সর্বোচ্চ অপরাধ হইতেছে জন্মের বৈধতা সম্পর্কে কটূক্তি এবং অবৈধ আচরণ করা।

ধর্ম বিশ্বাস ও উৎসব—জড় উপাসনা ইহাদের ঐতিহ্যবাহিত পূজা। সর্বোচ্চ দেবতা হইলেন 'ঠাকুর'। তিনি ছোটখাটো দৈনন্দিন ব্যাপারে লক্ষ্য দেন না এবং কাহারও অনিষ্ট করেন না। তাহাছাড়া অন্যান্য দেব-দেবী হইল 'মারাং বুরু' (বড় পাহাড়) মঁড়েকোতুরুইকো, জাহের এরা, গ্রামের প্রান্তে আদিকালের গাছতলায় সাঁওতালদের 'জাহের থান' বা অন্যান্য দেবদেবীর থান। অন্যান্য দেবদেবী হইলেন শিং বোঙ্গা, জমশিম বোঙ্গা, গোঁসাই এরা, পরগনা বোঙ্গা, মাঝি হারাম বোঙ্গা ইত্যাদি। সাঁওতালদের কতকগুলি গ্রাম পূজা হইল এরঃশিম, হাঁরিয়াড় শিম, নাওয়াই জান্থাড়, মাহঃমড়ে ইত্যাদি। এবং শিম পূজা হইল বীজবপনের পূজা, হাঁরিয়াড়

সীম পুজা হইল ধান রোপণের পুজা, নাওয়াই ভাদ্রমাসের পুজা ; ভুট্টা বা আউশের নবান্ন হয়। জান্‌হিড়, ধান পাকার পুজা, 'বোঙ্গা' হইতেছে আর একটি দেবতা যিনি গ্রামের শান্তি রক্ষা করেন এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য মাঃমড়ের পুজা করে। ইহাদের ভূত প্রেত ডাইনিতে গভীর বিশ্বাস। দুষ্ট অশরীরী শক্তি হইতে রক্ষার জন্য নানা তুক্‌-তাক্‌ যাদুমন্ত্র করিয়া থাকে।

এই সকল পুজা ছাড়া সাঁওতালদের কয়েকটি পরব আছে। সোহরাই, বাহা হইল প্রধান পরব। তাহাদের মতে ফাল্গুন মাসকে প্রথম মাস বলা হয়। এই সময় পর্বতগাত্রে, বন-জঙ্গলে সর্বত্র যেন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই মাসে বাহা পরব অনুষ্ঠিত হয়। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী বা চতুর্দশী হইতে পরবের সূচনা, তিনদিন অথবা পাঁচদিন ধরিয়া পরব চলিতে থাকে। নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সারা অঞ্চল মাদল, ধাম্‌সা আর বাঁশির সুরে মুখরিত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিঙাও ব্যবহৃত হয়। মেয়েরা কালো কেশে রাঙা কুসুম গুঁজিয়া পরস্পরের কোমর জড়াইয়া সারিবদ্ধভাবে নৃত্য করে আর তাহার সঙ্গে পুরুষেরা বাঁশি ও মাদল বাজায়। কৃষির সঙ্গেও বহু পরব জড়িত যেমন আখন পরব, মাঘ—সীম, বাহা, বোঙ্গা, জুগনি—বিদা, করম পরব, ইদ পরব ইত্যাদি। সুতরাং কৃষিগোষ্ঠী সাঁওতাল জীবনে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তাহাদের জীবনকে সাবলীল ও প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহারা অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় অনেক অগ্রগণ্য। প্রায় ৮ শতাংশ আঞ্চলিক জ্ঞান সম্পন্ন। ১৯৭১ সালের সমীক্ষা হইতে দেখা যায়, প্রায় ১৮,৮৯১ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করিতেছে। আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ নানা কল্যাণমূলক কাজ করিয়া আসিতেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। অনেক সাঁওতাল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হইয়াছেন।

মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ

গারো (The Garo)

গারোদের সমাজজীবন মাতৃকেন্দ্রিক। তাহাছাড়া তাহারা স্থানান্তর কৃষি (Shifting cultivation)-র উপরও নির্ভরশীল। আকৃতিতে মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতিতে অত্যন্ত সহজ, সরল ও অতিথিপরায়ণ। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ইহারা উত্তর-পূর্ব ভারতে সংখ্যায় ছিল ৩,০৬,১১৩ জন। ১৯৭১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় চার লক্ষের মত। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যায় ২,৬২৩। গারো পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীর ৯১ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মাত্র ০.১০ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় ৮৯৮ জন এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ৪২৮ জন গারো বসবাস করে। গারোদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করেন এ. প্লেফেয়ার। ইহার পর ডঃ জ্যোৎস্নাকান্তি বসু, মাধব গোস্বামী, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি গবেষক ইহাদের সমাজজীবন নানাভাবে তুলিয়া ধরেন।

বাসস্থান—বসবাস অনুযায়ী গারোরা দুইভাগে বিভক্ত—পাহাড়ী গারো এবং সমতলভূমির গারো। গারোরা প্রধানতঃ মেঘালয় রাজ্যের গারো পার্বত্য জেলায় বসবাস করে। যদিও গারো পার্বত্যভূমিতে মূলতঃ গারোদের বাস তথাপি ইহার সংলগ্ন কামরূপ, গোয়ালপাড়া এবং খাসি পার্বত্য ভূমিতে বাস করে, তাহাছাড়া বাসভূমির বহুদূরে আসামের ডারাং, মিকির পাহাড়, শিবসাগর জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ইহাদের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গের গারোরা মূলতঃ ময়মনসিংহ জেলা (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। গারা হইতে গারো শব্দটি আসিয়াছে ; প্লেফেয়ার সাহেবের মতে গারোদের আদি নিবাস তিব্বতে। গারোরা তিব্বত থেকে গারু নামে দলপতির সঙ্গে রওনা দেয় এবং তাঁহার নামানুসারে গারো নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

মেঘালয় রাজ্য, সমগ্র গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই রাজ্যের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং গারো পাহাড়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা এবং পূর্বে খাসিয়া পার্বত্যভূমি। বর্তমানে গারোরা

মেঘালয় রাজ্যের গারো পার্বত্য অঞ্চলেই বসবাস করে। ইহা প্রায় আট হাজার বর্গ কি. মি. অঞ্চল লইয়া বিস্তৃত। বর্তমানে গারো পার্বত্যভূমির সহিত বিশেষ যোগাযোগ হইয়াছে। তুরা হইতেছে এই রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার সহিত গৌহাটি, ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া প্রভৃতি শহর সড়ক দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে শিলং-এর সহিত তুরার সংযোগ রক্ষার জন্য সোজাসুজি সড়ক পথ তৈয়ারী হইতেছে।

এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নয়। নানা গাছপালায় গভীর বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চল শাল, লোহাকাঠ, ওক, পাইন, আর্কিড্ আর বাঁশের বনভূমি। আর তার সঙ্গে এই অরণ্যে নানা জীবজন্তুর বাস। বন্য জীবজন্তুর মধ্যে হাতী হইল প্রধান। তাহাছাড়া চিতাবাঘ, হরিণ, বন্যশূকর, বন্যমহিষ, কুকুর, নানাধরনের পাখী অরণ্যকে কল্লোলিত করিয়া রাখিয়াছে।

গারোদের শরীরের গঠন অনুযায়ী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহারা উচ্চতায় ছোটখাট, পুরুষদের উচ্চতা ৬১·৫" এবং স্ত্রীদের উচ্চতা ৫৮"। পাত্‌লা গঠন কিন্তু খুবই সুঠাম। চুল সোজা, চুলের রং কালো। খুব কম লোকেরই দাড়ি গোঁফ থাকে; কেবলমাত্র উপরের ঠোঁটের দুইদিকে কিছু চুল থাকে। গায়ের রং হলুদ আভা বিশিষ্ট, বাদামী। চোখে মঙ্গোলীয় ভাঁজ বর্তমান। নাক মাঝারি ও অবতল আকৃতির। মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, ভ্রূরেখা স্পষ্টই বোঝা যায়।

ভাষা—গারোরা যে ভাষায় কথা বলে তাহা সাইনো-তিব্বতী ভাষা। সুতরাং ইহাদের ভাষার সহিত কাছাড়ী, দাইমাসা, ত্রিপুরী, মোরাং, কুটিয়া, লালাং প্রভৃতিদের সহিত সম্পর্ক আছে। চীনা, বার্মা, তিব্বতী ভাষার সহিত কিছুটা মিল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের গারোরা বাংলা ভাষা বুঝিতে পারে। বর্তমানে রমান হরফে গারো ভাষায় কিছু বই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের লিখিত ভাষাকে বলে 'আউ'। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

গারোদের প্রধান জীবিকা হইল কৃষি। তাই জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চাষের উপর নির্ভর করিয়া কাটাইতে হয়। তাহাদের প্রধান জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইতে শিকার, মাছ ধরা চলে।

তাহাছাড়া তাহাদের চাষের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া; অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে। জঙ্গল হইতে কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা তাহাদের আর এক জীবিকা।

কৃষিকার্য—গারোরা অত্যন্ত প্রাচীন পন্থায় চাষাবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু এখানকার মাটি খুবই উর্বর হওয়ায় চাষের পক্ষে সহায়তা হয়। গারোরা যে পদ্ধতিতে চাষ করে তাহাকে বলে 'ঝুম' চাষ। প্রথমতঃ পর্বতগাত্রে কিছুটা জঙ্গল ঠিক করিয়া লয় তারপর শীতকালে, ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া ফেলে এবং মার্চ পর্যন্ত ইহাদের শুকনা করিবার জন্য ফেলিয়া রাখে। তারপর ইহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। গাছগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটির উপরে একটি আস্তরণ তৈয়ারী করে। ঠিক এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর এপ্রিল হইতে মে মাসের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া দেয়। মাটি নরম থাকিলে সময় সময় খোদন যন্ত্র দ্বারা মাটি গর্ত করিয়া কয়েকটি করিয়া বীজ মাটিতে পুঁতিয়া দেয়। জমি তৈয়ারীর প্রথম বৎসর একই জমিতে নানাবিধ শস্য উৎপাদন করে। যে সময় যে শস্য পাকে সেই সময় সেই শস্য সংগ্রহ করে। জুলাই মাসে জোয়ার সংগ্রহ করে, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে ধান পাকিলে ধান সংগ্রহ করে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তুলা সংগ্রহ করে। বর্ষার সময় আগাছা পরিষ্কার করা হয় কিন্তু যে জমিতে বাঁশ জন্মায় সেই জমি তিনবার পরিষ্কার করা হয়। এই ঝুম' জমি মাত্র দুই বৎসর চাষের আওতায় রাখে। দ্বিতীয় বৎসরে কেবল মাত্র ধান চাষ করে। তারপর কমপক্ষে সাত বৎসর ঐ জমিকে ফেলিয়া রাখে। শস্য পাকিলে তাহারা খড় কাটিয়া আনে না। জমি হইতে শস্য হাত দ্বারা মুষিয়া সংগ্রহ করে এবং শস্য রাখার জন্য দুইটি ঝুড়ি ব্যবহার করে। পিঠের দিকে একটি ঝুড়ি ফেলিয়া রাখে তাহাতে বেশীর ভাগ শস্য সংগ্রহ করে এবং সামনের কোমরে একটি ছোট ঝুড়ি বাঁধিয়া রাখে ইহাকে বলে 'কেরাং'। এই ঝুড়িতে বিশেষ করিয়া পরের বৎসরের জন্য ভাল শস্য সংগ্রহ করে।

মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী পাহাড়ী গারোরা জমিকে কর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু সমতলবাসী গারোরা অনেক সময় প্রতিবেশী বাঙালী বা অসমীয়াদের অনুকরণ করে।

পাহাড়ী গারোদের প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান, বর্ষার জলে ধান চাষ হয়।

উত্তরাঞ্চলের গারোরা জোয়ারের চাষ করে। ধান ও জোয়ার ছাড়া ভুট্টা, যব, লঙ্কা, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির চাষ করে, তাছাড়াও কিছু কিছু মিষ্টি আলু, আদা, নীল চাষ করিয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে প্রচুর পরিমাণে কমলা-লেবুর চাষ হয়। ধান চাষের মত তুলা চাষ ইহাদের একটি প্রধান জীবিকা। ইহাদের মধ্যে আটং, গাংচিং, দুয়াল গোষ্ঠী তুলা চাষ করে না কারণ ইহা তাহাদের নিকট কুসংস্কার। লাক্ষা চাষও গারোদের আর এক উপজীবিকা। ইহা বেশীর ভাগই পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উত্তরে গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে সোমেশ্বরী নদী, পূর্বে খাসি পর্বত এবং পশ্চিমে জীনারী নদী। এই চতুঃসীমা অঞ্চলে লাক্ষা চাষ হয়। ধান চাষের সঙ্গে সঙ্গে একই জমিতে লাক্ষা গাছের চাষ করে। এক একটি লাক্ষা গাছে প্রায় দুই কে. জি. করিয়া লাক্ষা জন্মায়। মেন্দু গাছ হইতে একপ্রকার শস্য জন্মায় ইহা গারোদের উপাদেয় খাদ্য।

শিকার—যদিও গারো পার্বত্য অঞ্চলে নানা বন্য প্রাণীর আবাস তথাপি আসামের অন্যান্য উপজাতির মত ইহারা শিকারে ততখানি পারদর্শী নয়। শিকারের জন্য নানারকম ফাঁদ (Trap) ব্যবহার করে। 'ওয়াসালা' একপ্রকার ফাঁদ অর্থাৎ ধনুকের সঙ্গে স্প্রিং বাঁধিয়া রাখে এবং শিকারের দৈনন্দিন গমনাগমন পথে রাখিয়া দেয়। সময় সময় দু-তিনটি গ্রাম একত্রিত হইয়া সমবেত শিকারে বাহির হয়। ইহাতে মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করে। একপ্রান্ত হইতে শিকারকে তাড়া করে। খুঁটিতে বাধা পাইয়া দুইটি খুঁটির মাঝখানের পথ দিয়া শিকার বাহির হইতে যায়। সেই সময় পিটাইয়া বা বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। এইভাবে এক-এক দিনে ৬০।৭০টি শূকর শিকার করে। বর্তমানে বন্দুক ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য শিকার—গারো গ্রামগুলি প্রায় পাহাড়ী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। সুতরাং মৎস্য শিকারে ইহারা ভীষণ পটু। প্রধান জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য শিকার আর একটি জীবিকা। নদীতে বন্যার সময় মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত সময়। নদীর গতিপথে মাঝামাঝি বাঁধ তৈয়ারী করা হয় এবং জল বাহির হওয়ার জন্য কতকগুলি নিকাশী পথ থাকে। এবং সেই স্থানে বাঁশের তৈয়ারী বাক্স ফাঁদ পাতিয়া রাখা হয়। তখন মাছ নদী-প্রবাহের সঙ্গে বাক্স ফাঁদে ধরা পড়ে। এই ফাঁদকে তাহারা 'নাজিল' বলে। আরও নানা ধরনের খাঁচা ফাঁদ দ্বারা মৎস্য শিকার করে। কখনও বা

বিষাক্ত রস প্রয়োগ দ্বারা মৎস্য শিকার করে। ছিপ্-এর সাহায্যে মাছ ধরা খুবই প্রচলিত।

বাণিজ্য—গারোরা উৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ করিয়া তুলা, লাক্ষা, লেবু প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় করে। বাজারে অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিয়া আনে। কিছু সংখ্যক গারো বনবিভাগে কর্মী, বাগিচা ও খনির উপর নির্ভরশীল। তাহাছাড়া অনেকে নানা ধরনের চাকুরীতে নিযুক্ত আছে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—গাছ কাটার জন্য দা ব্যবহার করে। মাটি খোঁড়ার জন্য কোদালি হইল প্রধান। ইহার কার্যকরী অংশ লোহার তৈয়ারী, এই কার্যকরী অংশ বাঁশের দণ্ডের সহিত যুক্ত। আগাছা এবং মূল পরিষ্কারের জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রধান হইতেছে তলোয়ার এবং বর্শা। ঘরের বাহির হইলেই ইহার যে কোন একটি সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। তলোয়ারে নানা নক্সা আঁকা থাকে। ইহা তিন চার ফুট লম্বা। দু-ইঞ্চি চওড়া ফলা। ইহার অগ্রভাগ তীরের মত সূচাল। হাতল থেকে সূঁচাল অংশ পর্যন্ত কেবল মাত্র লোহারই তৈয়ারী। হাতলটি সোজা নয় কিছু বাঁকান এবং ফলা অংশ চওড়া ও প্রান্তভাগ ধারাল। ইহার মাথা গোলাকার। হাতলের দুই ধারে একগোছা করিয়া গরুর লেজের চুল থাকে।

গারো বর্শা একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ইহার ফলা ১২" থেকে ১৪" লম্বা এবং ২।৩" চওড়া। ইহা খুবই ধারাল। এই ফলা ৫' লম্বা একটি দণ্ডের সহিত যুক্ত। বড় বড় শিকার অভিযানের সময় বর্শা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তীর-ধনুক ইহাদের খুবই পরিচিত কিন্তু ইহা কদাচিৎ ব্যবহার করে। কাটারি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির হয়। গারোরা দুই ধরনের ঢাল ব্যবহার করে। 'সেপী' সম্পূর্ণরূপে কাঠের তৈয়ারী অথবা লম্বা কাঠের ফালিগুলি বাঁধা এবং পাত্‌লা বেতের বা বাঁশের ছিল্‌কা দ্বারা ঢাকা। অপরপক্ষে 'ডানিল' ভালুক অথবা গরুর চামড়ার তৈয়ারী একটি কাঠের ফ্রেম-এর সহিত বাঁধা থাকে। উভয় ঢালই একই মাপের। ইহারা ৩'×১½' ও কিছুটা অবতল আকৃতির, পিছন দিকে কিছুটা বাঁকান। ইহারা বেতের হাতলের সহিত সংযুক্ত।

মৎস্য শিকারের যন্ত্র হইতেছে বড় ধরনের ফাঁদ 'চেকিউ' (Chekwe)। ইহা বাঁশের ছিল্‌কার তৈয়ারী খাঁচা, ৬।৭ ফুট লম্বা। ছোট ধরনের ফাঁদ 'আসক্‌'। কখনও কখনও কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা। 'চেক্রী' হইতেছে বাক্স আকৃতির, কতকটা জল তোলা পাত্রের মত। মৎস্য শিকারের বল্লমের উভয় দিকে খাঁজ আছে এবং দড়ির দ্বারা দণ্ডের সহিত যুক্ত থাকে।

পশুপালন—গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মধ্যে ছাগল, শূকর, মুরগী, হাঁস হইল প্রধান। গরু সাধারণতঃ সমতলবাসীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। কুকুর বিড়ালও তাহারা পালন করে। এইগুলি সবই গৃহপালিতরূপে খাদ্যের জন্য পালন করে।

খাদ্য—গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। অনেক সময় ভাতের পরিবর্তে বজরা, ভুট্টা, যব খাইয়া থাকে। এইগুলি কেবলমাত্র সিদ্ধ করিয়া প্রধান খাদ্যের সহিত নানাবিধ শাক-সব্জি খায়। তাহাছাড়া জঙ্গল হইতে নানাবিধ বন্য লতাপাতা, মূল সংগ্রহ করে এবং সেগুলি সিদ্ধ করিয়া খায়, বাঁশের অঙ্কুর সিদ্ধ করিয়া খাওয়া অথবা আলাদাভাবে রান্না করিয়া খাওয়া তাহাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। গারোরা প্রায় সকল প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে। গৃহপালিত পশু ছাগল, শূকর, মুরগী, পাতিহাঁস প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করে এবং বড়ো শ্রেণীর গারোরা গরু মাংস খায়। ইহাছাড়া প্রায় সমস্ত পাহাড়ী গারোরা গরু, কুকুর, বিড়াল এবং সকল বন্য প্রাণী এমনকি বাঘের মাংস খায়। বাজারে কুকুর ছানা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এইগুলি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা কয়েক ধরনের গিরগিটি এবং সাপ, সাদা পিপীলিকা খাইতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। শুকনা মাছ তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। ইহাকে 'নোকাম' বলে। গারোরা লবণ এবং লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে কিন্তু রান্নার সঙ্গে তেল বা চর্বি খায় না।

ইহারা দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণে খুবই সচেতন এবং খাদ্য সম্বন্ধে মিতব্যয়ী। দিনে তিনবার প্রধান খাদ্য খায় এবং যখনই বাইরে বাহির হয় তখনই কিছু খাদ্য সঙ্গে লইয়া বাহির হয়।

গারোরা কখনই দুধ খায় না। দুধকে মূত্রের সমান মনে করে। তবে বর্তমানে এই কুসংস্কার কাটিয়া গিয়াছে। গারোরা ভাত, ভুট্টা, যব পচাইয়া মদ তৈয়ারী করিয়া পান করে। নানা গাছগাছড়া এবং ফলের সহিত

চালের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া গোলাকৃতি বা চওড়া পিঠার মত বস্তু তৈয়ারী করে ইহাকে 'ওয়ান্টি' বলে। ইহার সহিত ইস্ট মিশ্রিত করিয়া মাদকদ্রব্য রূপে খাইয়া থাকে। ইহা দু-তিনমাস স্থায়ী হয়।

গ্রাম ও ঘরবাড়ী—নাগা এবং লুসাইদের মতই গারোরা পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলি গড়িয়া তুলে এবং প্রত্যেকটি গ্রাম ঠিক পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়া থাকে, যেন পানীয় জলের অভাব না ঘটে। প্রশস্ত সমতলভূমি অঞ্চলে খুব কম গ্রামই দেখা যায়। গ্রামের প্রবেশ পথে থাকে কাঁঠাল গাছের সারি। গ্রাম পত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে কলের গাছ বসান তাহাদের চিরাচরিত প্রথা। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যস্থলে সর্বসাধারণের জন্য একটি খোলা জায়গা থাকে, বিশেষতঃ এইস্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

ঘরের মধ্যস্থলে সারার সামনে অবিবাহিত ছেলেদের ঘুমঘর 'নোকপান্তে' অবস্থিত। এই স্থানে অবিবাহিত ছেলেরা রাত্রিযাপন করে, আবার বয়স্কদের সভাসমিতির স্থান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। গ্রামের মাঝে মাঝে দেব-দেবীর স্থান। এক একটি গ্রামে দু-তিনশ ঘর বসতি থাকে। বাহির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য গ্রামগুলি বাঁশের বেড়ার দ্বারা খুবই সুরক্ষিত। গ্রামগুলি পাড়াতে বিভক্ত এবং পাড়ার একজন করিয়া প্রধান বা নকৃমা থাকে তার নামানুসারে পাড়ার নাম হয়।

ঘরগুলি খুবই ঘনভাবে বিন্যস্ত। ঘরের সামনের দিকে থাকে উঠান এবং পিছনে ঘন জঙ্গল। ঘরগুলি খুবই লম্বা। কাঠের খুঁটির উপর পাটাতন তৈয়ারী করিয়া ঘর তৈয়ারী করা তাহাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। পাটাতনের উপর কাঠের খুঁটির আড়কাঠ থাকে। এই আড়কাঠের উপর বাঁশের দলমা পাতিয়া তারপর ঘাস বা পাতা দ্বারা পুরু ছাউনি তৈয়ারী করে। ছাউনি পচিয়া যাওয়ার জন্য প্রত্যেক বৎসর ছাউনি বদলাইয়া দেয়। ঘরের কোন জানালা থাকে না কিন্তু উভয় প্রান্তে দুইদিকে দুইটি দরজা থাকে। ঘরগুলি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

প্রকোষ্ঠের প্রথমের অংশকে বলে নোকুরা। ইহা পাটাতনের উপরে তৈয়ারী করে না। ইহার মেঝে মাটির তৈয়ারী। এই অংশে থাকে শস্য কুটার উদুখল, শুক্না জ্বালানি কাঠ, ও অন্যান্য গৃহস্থলীর আসবাবপত্র এবং সময় সময় গবাদি পশু। প্রথম কামরার দু-তিন ধাপ উপরে দ্বিতীয় কামরা নোকগাঁচি অবস্থিত। ইহা পাটাতনের উপরে তৈয়ারী, ইহা সমস্ত ঘরের

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এবং পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের থাকিবার স্থান। ইহা অচিহ্নিত দুইটি অংশে বিভক্ত, প্রথমটিতে গৃহ দেবতার থান, ইহাকে বলে 'মালজুরী' দ্বিতীয় অংশে মদ তৈয়ারী এবং রান্নার স্থান 'চুদীম্রা'। এই অংশে অবিবাহিত মেয়েদের ঘুমানোর স্থান।

'নোকারিং বা ত্নুন'—ইহাই শেষ কামরা ও প্রধান শয়নকক্ষ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি বারান্দা থাকে। মেয়ের বিবাহ হইলে বিবাহিত মেয়ে এবং জামাতার জন্য এই ঘরেরই একটি আলাদা কক্ষ তৈয়ারী করিয়া দেয় যাহা শয়নঘর হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রত্যেক পরিবারের ধান কুটার জন্য একটি করিয়া উদুখল থাকে। গৃহিণী ধান কুটাতে বা সূতা কাটিতে অথবা কাপড় বুনিতে ব্যস্ত থাকে। প্রত্যেক পরিবারে দু-একটি করিয়া শস্য ভাণ্ডার থাকে। গ্রামের সকল পরিবারের শস্য ভাণ্ডারগুলি একই জায়গায় বসতবাড়ী হইতে দূরে অবস্থিত, যাহাতে আগুনের সংস্পর্শে না আসিতে পারে এবং শস্য ভাণ্ডারগুলি খুবই সুরক্ষিত যাহাতে অন্যান্য প্রাণী সহজে শস্য নষ্ট করিতে না পারে। শস্য ভাণ্ডারের মধ্যে বাঁশের ঝুড়িতে থাকে ধান॥ এক কোণে থাকে খাদ্য মূল ও কাণ্ড। পাহাড় গাত্রে ঘর ছাড়াও বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য গাছের উপর ঘর তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে, মই দ্বারা মাটির সহিত যুক্ত থাকে। এবং গ্রামগুলির স্থায়ীত্ব কুড়ি-ত্রিশ বৎসরেও পরিবর্তন হয় না।

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র—গারো পরিবারে বিশেষ কিছু আসবাবপত্র থাকে না। ঘরের উঁচু পাটাতনই শয়ন করার পক্ষে যথেষ্ট। কোন কোন সময় অতিথিদের বসার জন্য বেতের চেয়ার থাকে। মূল্যবান বস্তু রাখার জন্য বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করে এবং ঘরের ছাদ হইতে ঝুলাইয়া রাখে। রান্না করার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করে, ইহা সমতলভূমির ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ক্রয় করে। মদ রাখার জন্য বড় মাটির কলসী ব্যবহার করে। বাঁশেরই চোঙ মদ পানের পাত্র এবং চামচ হিসাবে ব্যবহার করে। কলাপাতা, খাওয়ার থালা হিসাবে ব্যবহার করে। পানীয় জল মজুত রাখার জন্য লাউ-এর খোলের পাত্র ব্যবহার করে। লাউ যখন শুষ্ক হইয়া যায় ইহার ভিতরের অংশ বাহির করিয়া লয় এবং একদিকে গর্ত করিয়া থাকে। সেই গর্ত দিয়া জল ভরিয়া থাকে। খাদ্যবস্তু রাখার জন্য

নানা আকৃতির বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করে এবং ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। বাজারে তুলা বহনের জন্য প্রায় ৭ ফুট লম্বা বাঁশের ঝুড়িতে তুলা ভরিয়া পিঠে করিয়া বহন করে। বৃষ্টির সময় বেতের পাতার ছাতা ব্যবহার করে।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কয়েক ধরনের মাদল বা ঢোল, বাঁশ এবং শিং এর তৈয়ারী বাঁশী প্রধান। ধাতুর তৈয়ারী পেটা ঘড়ি ও করতাল ব্যবহার করে। ঘাড় বা করতাল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে, কিন্তু অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈয়ারী করে। সব থেকে বড় ঢোল হইতেছে 'ডামা', কাঠের তৈয়ারী মাঝখানটা মোটা উভয় দিক ক্রমশঃ সরু এবং গরুর চামড়া দ্বারা ছাওয়া। 'ক্র্যাম্' (Kram) কাঠের তৈয়ারী একদিক গোলাকৃতি চওড়া এবং অপরপ্রান্তে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। চওড়া দিকে গরুর চামড়া দ্বারা ছাওয়া। 'নাদিক' ছোট কাঠের ঢোল। 'আদিল' এক প্রকার বাঁশী মহিষের শিং-এর তৈয়ারী। 'ওটেক্রা' প্রায় এক গজ লম্বা বাঁশের তৈয়ারী বাঁশী। আরও নানা ধরনের বাঁশী ব্যবহার করে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—গারোদের পোশাক অত্যন্ত প্রাচীন। পুরুষেরা কৌপীন জাতীয় কাপড় পরিধান করে। ইহাকে 'গ্যানডো' বলে। ইহা ৬।৭ ফুট লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি চওড়া লাল এবং নীল রঙের ডোরা কাটা থাকে। ইহা সামনের দিকে প্রায় এক ফুট ঝুলান থাকে। এই কাপড় কখনও কখনও অলংকৃত করা থাকে। পুঁতির কয়েকটি লাইন থাকে আবার ছোট ছোট শাঁখের খোলস দ্বারাও সজ্জিত করা থাকে। পুরুষের মাথায় গাঢ়ো নীল বা সাদা কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করে। উৎসবের দিন আসামী সিল্ক পরিধান করে। শীতের সময় তুলা অথবা কম্বল দ্বারা সারা শরীর ঢাকা দেয়। শীতের সময় কোটও পরিধান করে।

গারো মেয়েরা সায়ার মত ঘাগ্রা পরিধান করে। ইহা ১৮" লম্বা এবং শুধু কোমরে জড়ানোর মত চওড়া, ইহার দুইপাশে জানুর উপর ঝুলন্ত অবস্থায় দুইটি দড়ি ঝুলাইয়া রাখে। ইহাকে 'রিকিং বলে, শরীরের উপরের অংশে সাদা ও নীল রঙের শাল ব্যবহার করে। সমতলভূমির গারোরা অসমীয়া এবং বাঙালীদের মত পোশাক পরিধান করে। গারোরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। পুরুষেরা পিতলের তৈয়ারী দুই ধরনের কানে কুণ্ডল পরিধান করে। যাহা কানের পাতাতে পরিধান করে তাহাকে বলে 'নাডংবি' এবং এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট। এক একজন প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি

কুণ্ডল একই সঙ্গে পরিধান করে। যাহা কানের উপরের অংশে পরিধান করে তাহাকে বলে 'নাডিরং', খুব ছোট পিতলের কুণ্ডল। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই নানা রঙের লম্বা চোঙাকৃতি পুঁতির হার পরিধান করে। গ্রামের নোক্‌মা অর্থাৎ গ্রামের প্রধান অদ্ভুত ধরনের লোহার তৈয়ারী কানে কুণ্ডল পরিধান করে, ইহাকে 'জাক্‌সিল' বলে। পুরুষদের মত মেয়েরাও কানে কুণ্ডল পরে। মেয়েরা হাতে পুঁতির তৈয়ারী গোছাকৃতি ভাবে চুড়ি, ব্রোঞ্জ, পিতলের তৈয়ারী ব্রেসলেট পরিধান করে। মেয়েরা নৃত্যগীত করার সময় আট ইঞ্চি লম্বা বাঁশের চিরুনি একটি কাপড়ের সহিত আটকাইয়া রাখে, এই কাপড়ে নানা পুঁতির অলঙ্কার থাকে। ইহাকে 'সেন্‌কী' বলে। মেয়েরা বিনুনী করিয়া চুল বাঁধে এবং বিনুনীর সহিত চিরুনি কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। পাহাড়ী গারোরা কোন সময়ই শরীরে উল্কি কাটে না, সময় সময় সমতলভূমির গারোরা উল্কি কাটে।

হস্তশিল্প—গারোরা হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শী নয়। ইহারা কিছু কিছু তাঁতের কাজ, মাদুর বুনন, নৌকা তৈয়ারী এবং কতকগুলি খুব সাধারণ লোহার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। নানাধরনের গাছের বল্কল হইতে নানা রঙ প্রস্তুত করে এবং এই রঙ দ্বারা কাপড়ে, কম্বলে রঙ করে।

সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম—গারোরা নিজেদিগকে আ-চিক্ অর্থাৎ পাহাড়ী মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। যে সকল গারো অন্য মানুষের সংস্পর্শ হইতে দূরে বাস করে তাহারা নিজেদের 'মান্দে' বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার অর্থ সাধারণ মানুষ।

গারোদের সামাজিক গঠন কয়েকটি ছোটবড় সামাজিক সংস্থা লইয়া গঠিত। ইহাদের সামাজিক গঠন হইতেছে উপজাতি—খণ্ডজাতি—উপ-শ্রেণী (চাট্‌চি)—গোত্র (মাচাং)—উপগোত্র (বাইপেক্)—বংশ (মাহারি) —পরিবার (নোক্)—সভ্য (আ—চিক্)। প্রথমতঃ গারোরা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) পার্বত্যভূমির গারো (খ) সমতল ভূমির গারো। পার্বত্যভূমির গারোরা তাহাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুযায়ী ১২টি আঞ্চলিক খণ্ড জাতিতে বিভক্ত। ইহারা যথাক্রমে

খণ্ডজাতি (Sub tribe)—(১ **আকাওই বা অউই**—সমগ্র **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও ইহার পাদদেশ অঞ্চল অর্থাৎ কামরূপের পূর্ব**

সীমান্ত হইতে পশ্চিমে জীনারী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আকাউইরা বাস করে। আকাউই অর্থে সমতলবাসী এবং আউই অর্থে লাঙ্গল চাষী।

(২) **চিসাক**—উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল চিসাক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরের আউই এর দক্ষিণ সীমান্ত হইতে দক্ষিণে সোমেশ্বরী নদী এবং পূর্বে খাসি পর্বতের পশ্চিম সীমান্ত হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। চিসাক গোষ্ঠী আউইদের অনুরূপ কেবলমাত্র পোশাক ও সংস্কৃতিতে কিছু তফাত।

(৩) **দুয়াল**—চিসাকদের দক্ষিণের অঞ্চল দুয়াল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সোমেশ্বরী নদীর তীরে যেখানে নদী, সমতলভূমির দিকে বাঁক লইয়াছে। ইহার বেশীর ভাগই সমতলভূমি ময়মনসিং-এর অধিবাসী।

(৪) **মাচি**—সোমেশ্বরী নদীর মধ্য উপত্যকা হইতে দুয়ালের পশ্চিম সীমান্ত যেখানে আউই-এর সহিত মিশিয়াছে।

(৫) **ম্যাটজাংচি**—ইহাদের মেটাবেংও বলা হয়। সোমেশ্বরী নদীর উপরিভাগ অঞ্চল ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা মাচির প্রতিবেশী গোষ্ঠী।

(৬) **কোচ**—কোচ গোষ্ঠী খুবই সংখ্যালঘু। উত্তর-পশ্চিমের পর্বত হইতে জিনারী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৭) **আতিয়াগ্রাস**—আর একটি গারোদের ছোট গোষ্ঠী কোচেদের দক্ষিণে বাস করে। কোচ এবং আউইদের সহিত একই সম্পর্ক রহিয়াছে।

(৮) **আবেং**—গারোদের মধ্যে সবথেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক গোষ্ঠী। ইহারা সমগ্র পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চল, বোগাই নদীর পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৯) **চিবোক**—আবেংদের পূর্বে বোগাই নদীর উপরের তটভূমি হইতে নিতাই নদীর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ইহাদের বাস।

(১০) **রুগা**—পর্বতের নিম্ন অঞ্চলে ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল রুগা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(১১) **গারাচিং বা গারা**—নিতাই নদী হইতে সোমেশ্বরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইহাদের বাস।

(১২) **আটং**—ইহারা গারোদের একটি বিশেষ বিভাগ। সোমেশ্ব নদী উপত্যকা হইতে সীজু পাহাড় পর্যন্ত অঞ্চলে ইহাদের বাস।

পার্বত্য ভূমির গারো ছাড়াও সমতলভূমিতে গারোদের এক শাখা বসবাস

করে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় এমনকি ঢাকা জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় ইহাদের বসবাস। পার্বত্য-ভূমির গারোদের মত ইহারাও একই রকম গোষ্ঠীতে বিভক্ত যেমন আবেং, চিসাক, দুলা ইত্যাদি।

উপশ্রেণী (Sub-group)—সমগ্র খণ্ড জাতিগুলি তিনটি উপশ্রেণীতে বা চাটচিতে বিভক্ত। ইহারা যথাক্রমে মোমিন, মারাক্, সাংমা। মোমিন চাট্‌চি কেবলমাত্র আকাউই খণ্ডজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। অপর দুইটি চাট্‌চি অন্যান্য সকল খণ্ড জাতির মধ্যে বিদ্যমান। উপশ্রেণীগুলি গোত্রে বিভক্ত।

গোত্র (Clan)—ইহারা গোত্রকে বলে 'মাচাং'। প্লেফেয়ার-এর মতে গারোদের মধ্যে ১২৭টি গোত্র রহিয়াছে। গারোরা মাতৃ-কেন্দ্রিক অর্থাৎ অবিবাহিত পুত্র কন্যারা মাতার গোত্র পাইয়া থাকে। তাহারা মনে করে তাহারা সকলে একই গোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পরে অন্যান্য গোত্রে বিভক্ত হইয়াছে। গারোরা বহির্বিবাহমূলক নীতি পালন করে অর্থাৎ একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ হয় না। কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিলে সে সামাজিক পাপী বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। বর্তমানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। কেহ কেহ তাহার মাতার গোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেকটি মাচাং এর স্বতন্ত্র গোত্র দেবতা থাকে। ইহারা পশুপক্ষী বা গাছপালার নামানুসারে হইয়া থাকে। যেমন, মারাক গোষ্ঠীর রাংসাং গোত্রের গোত্র দেবতা হইতেছে ভল্লুক। আবার মোমিন গোষ্ঠীর নারিংগ্রি গোত্রের গোত্র দেবতা হইতেছে ঘুঘু পাখী; কোক্‌নল গোত্র সাংমা হইতে উদ্ভূত। কোক্ অর্থে গারো ঝুড়ি। দুপো গোত্রের গোত্র দেবতা পেঁচা, গারা এক ধরনের গিরিগিটি, মেচেং এক ধরনের চারাগাছ। এইভাবে প্রত্যেকটি গোত্রের একটি করিয়া গোত্র দেবতা থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ক্ষতি করিতে বা মারিতে কুণ্ঠা বোধ করে না এবং তাহাদের খাইতে বা নষ্ট করিতে সে রকম বাধা নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে বা বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কর্ম নাই। গোত্রগুলি আবার উপ-গোত্রে (Sub-clan) বিভক্ত যেমন, গাবিল গোত্রের পাঁচটি উপ-গোত্র বর্তমান। গাবিল চিংসিল, গাবিল দোবিত, গাবিল দানিংক্বা, গাবিল ওয়াট্রি, গাবিল ওয়াচেক্‌সি।

বংশ (Lineage)—উপ-গোত্রগুলি আরও ক্ষুদ্রতম সংস্থা বংশ বা 'মাহারি'তে বিভক্ত। এক-একটি গ্রামে এক-একটি মাহারি গোষ্ঠীর গারো বাস করে। গ্রামের নামানুসারে মাহারির নাম হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ চাংবুগং গোত্রের লোকেরা মেগংগিরি গ্রামে বাস করে সুতরাং বংশের নাম মেগংগিরি চাংবুগং। মাহারি অনুযায়ী চার-পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত রক্ত সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মাহারিকে যৌথ পরিবার-রূপেও ধরা যাইতে পারে। একই বংশে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বংশের নামে সম্পত্তিও থাকে। সেই সম্পত্তি বংশের বয়স্কদের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করিতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বংশের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করিতে পারে না।

পরিবার (Family)—বংশগুলি গারোদের ক্ষুদ্রতম সংস্থা পরিবারে বিভক্ত। গারোরা পরিবারকে বলে 'নোক্'। ইহার অর্থ হইতেছে ঘর। নোক্ কথার দ্বারা জৈবিক (Biological) পরিবারও বুঝায় আবার ঘরবাড়ীকেও বুঝায়। সেইজন্য 'নোকডাং' শব্দ ব্যবহার করে। যাহার দ্বারা পরিবার এবং ঘরবাড়ী সব কিছুই বুঝাইয়া যায়। গারোদের পরিবার স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র কন্যাদের লইয়া গঠিত। ইহাকে প্রাথমিক পরিবার বলে।

যৌথ পরিবারও দেখা যায় অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী তাহাদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা এবং তাহাদের বিবাহিতা কন্যা (আপন অথবা পালিতা) ও নোকরাম জামাতা আরও অন্যান্য রক্ত সম্বন্ধীয় সভ্যদের লইয়া গঠিত। বিবাহ অনুযায়ী গারোদের মধ্যে দুই ধরনের পরিবার বর্তমান। যথা (ক) নোকরম (Nokrom) পরিবার এবং (খ) 'আগাতে' (Agate) পরিবার। (ক) নোকরম পরিবার হইতেছে বিবাহের পর যখন স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাস করে এবং পরিবার গঠন করে। (খ) আগাতে পরিবার হইতেছে বিবাহের পর স্ত্রীর বাড়ীতে স্বামীর বসবাস বাধ্যতামূলক নয়। দু-এক বৎসর স্ত্রীর বাড়ীতে বাস করার পর আগাতে জামাতা শ্বশুরের গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অথবা নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বসবাস করে।

বসতি অনুযায়ী গারোদের মধ্যে তিন ধরনের পরিবার দেখা যায়। (ক) মাতৃকেন্দ্রিক (Uxorilocal) পরিবার অর্থাৎ স্বামী যখন স্ত্রীর বাড়ীতে

আসিয়া বসবাস করে (খ) পিতৃকেন্দ্রিক (Virilocal) পরিবার অর্থাৎ স্বামী যখন নিজের গ্রামে বসবাস করে এবং পরিবার গঠন করে। (গ) নূতন বাসস্থান পরিবার (Neolocal)—বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী যখন মাতৃ-পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ছাড়িয়া নূতনভাবে বসবাস করে। ইহাছাড়া বহু পত্নী মূলক পরিবারও দেখা যায়।

পরিবারের মধ্যে পিতাই পরিবারের কর্তা। তাহাকে বলে 'নোক্-জীপা'। তিনি পরিবারের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তত্ত্বাবধান করেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমানভাবে কাজ করে। কাজের ভার দুইজনেরই সমান। তথাপি একদিকে ভারী কাজ যেমন ঝুম জমি তৈয়ারী করা, গাছ কাটা, ঘর তৈয়ারী করা প্রভৃতি পুরুষরাই করিয়া থাকে। অপরদিকে গাছ বসান, শস্য কাটা, গৃহস্থালীর কাজ, রান্না করা, মদ তৈয়ারী করা, জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ, পানীয় জল সংগ্রহ প্রভৃতি সকলই মেয়েদের কাজ। এমনকি গৃহস্থালী সম্পত্তি বা চাষের জমি আদান-প্রদান সকলই পুরুষদের দায়িত্ব, যদিও স্ত্রীর মতামত লইয়া কাজ করিয়া থাকে।

আত্মীয়তা সম্বন্ধ—গারো সমাজ পরস্পর আত্মীয়তা বা জ্ঞাতি সম্বন্ধে আবদ্ধ। মাতৃ এবং পিতৃ উভয় দিকেই রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। কাকা এবং মেসো, পিসি এবং মামী একই রক্ত সম্বন্ধীয় বলিয়া মনে করে। আবার বিবাহের মাধ্যমেও নূতন আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভগ্নীর পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করে তখন নূতন আত্মীয়তাবদ্ধ হয়। একদিকে রক্ত সম্বন্ধীয় সম্পর্ক অপরদিকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন মামা হয় শ্বশুর মহাশয় এবং ভাগ্না হয় জামাতা। দুই রকম সম্বন্ধের জন্য দুই রকম নামে ডাকে। মাতার ভ্রাতা মামা এবং স্ত্রীর পিতা 'গুবিতে'।

জীবনচক্র—গারোদের জীবনচক্র কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠান লইয়া গঠিত যেমন জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু।

জন্ম—যখনই বুঝিতে পারে স্ত্রী অন্তঃসত্বা হইয়াছে তখনই স্বামী দেবতার উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল, মুরগী উৎসর্গ করিবার জন্য মানত করে যাহাতে তাড়াতাড়ি এবং স্বাভাবিকভাবে নিরাপদে প্রসব হইয়া যায়। যদি প্রসব

হইতে দেরী হয় তাহা হইলে বুঝিতে পারে কোন অশরীরী আত্মার কু-দৃষ্টির ফলে ইহা ঘটিয়াছে। তখন 'কামাল' অর্থাৎ ওঝা ঐ দুষ্ট আত্মাকে সরানোর জন্য পশুপক্ষী বলি দেয় এবং যাদু মন্ত্র করে। অপরদিকে উপস্থিত বৃদ্ধা মহিলারা ঐ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর চতুর্দিকে মেঝেতে চাউল ছড়াইতে থাকে এবং বলে 'দুষ্ট ভূত চলিয়া যাও' যদি শিশুর জন্ম হইতে আরও সময় লাগে তখন 'কামাল' বা ওঝা একটি ছাগলকে রোগীর সংস্পর্শে লইয়া আসে এবং একই সময়ে মুখের মধ্যে একটু জল লইয়া থাকে ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপরে মুখ হইতে ফোয়ারা করিয়া বাহির করে। ইহার অর্থ ভাল ফল হইবে এবং তাড়াতাড়ি প্রসব হইয়া যাইবে। এই প্রথা 'আকাউই' সমাজের মধ্যে দেখা যায়। 'আবেং' গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু তফাত দেখা যায়। ছাগলকে গর্ভবতী স্ত্রীর সংস্পর্শে আনিয়া তাহার কিছু লোম তুলিয়া লয় এবং তাহার সম্মুখে পুড়াইয়া ফেলে। পরে দুষ্ট ভূতের উদ্দেশ্যে ছাগলকে উৎসর্গ করে। ছেলের জন্ম হওয়ার পর নাভিচ্ছেদন করে। তারপর সদ্যজাত শিশু এবং প্রসূতিকে ঝর্নাতে স্নান করায়। তাহারা ফিরিয়া আসার পর আর একটি অনুষ্ঠান হয়। ঘরের মধ্যে বাঁশ দাঁড় করাইয়া নীচে বেদী তৈয়ারী করে এবং শিশুর পিতা একটি মুরগীকে লইয়া বাঁশের উপরে যায় ও তাহার শিরশ্ছেদন করে এবং ঐ রক্ত ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। মুরগীর ঠোঁট ও গলার থলি কলাপাতায় রাখিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করে। পরে মুরগীর মাংস শিশুর পিতা এবং ওঝা ভক্ষণ করে। তারপরে শিশুর মাথা মুণ্ডন করে ইহাকে বলে 'বী মীনগু গালা' এবং অনুষ্ঠানকে আবেংরা বলে 'টংগ্রিংমা দেনপাকা' ও আকাউই ও মাচিরা বলে 'জাংকিপংতা'। যে দিন শিশুর জন্ম হয় সে দিন গ্রামের কেহ চাষের কাজে বাহির হয় না। তাহাদের বিশ্বাস ঐ দিন মাঠে যাইলে শস্যের ক্ষতি হইবে।

নামকরণ উৎসব—গারোদের মধ্যে শিশুর নামকরণ উৎসব প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু আবেংদের মধ্যে শিশুর জন্ম হওয়ার পরই বিশেষতঃ তিন সপ্তাহ এক মাসের পর শিশুর নামকরণ করিয়া থাকে। টংগ্রিংমা দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেয় এবং শিশুর মা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা নানা নাম বলিতে থাকে। ঐ সময় শিশুর নাম দেওয়া হয় কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত পূর্ব-পুরুষের নামে। সম্প্রতি মারা গিয়াছে এমন পূর্ব-পুরুষের নামে নামকরণ করে না কারণ তাহারা মনে করে ইহাতে শিশু অসুখী হয়।

অনেক সময় মৃত পূর্ব পুরুষের ন্যায় দেখিতে হইলে তাহারা মনে করে পূর্ব পুরুষের আত্মা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বিবাহ—গারোরা মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করে। ইহাদের সমাজে বহির্বিবাহ মূলক রীতি প্রচলিত অর্থাৎ একই গোত্রে বা একই মাতার বংশে বিবাহ হয় না। ইহার কেহ ব্যতিক্রম করিলে সে সামাজিক পাপী বলিয়া গণ্য হয়। এবং তাহাকে সামাজিক শাস্তি পাইতে হয়। বর্তমানে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিতেছে একই গোত্রে এমন কি মাতার বংশে বিবাহ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এক বিবাহ গারো সমাজে প্রচলিত। বহুপত্নী বিবাহ অর্থাৎ একজন লোক অনেকগুলি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু তিনজনের বেশী বিবাহ করিতে পারে না। শালি প্রধান বহুপত্নী অর্থাৎ একজন পুরুষ দুই বোনকে বিবাহ করিতে পারে। প্রথমে বড় বোনকে বিবাহ করিতে হইবে পরে বড় বোনের মতামত লইয়া তাহার ছোট বোনকে বিবাহ করিতে পারে। একজন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রথম স্ত্রীর অনুমতিলইয়া বিবাহ করিতে হয়। অনেক সময় এই মতামত লইবার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। প্রথম স্ত্রীকে বলা হয় জীক্-মামং অথবা জীক্-মংমা, তিনিই প্রধানা স্ত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলা হয় জীক্-গাইট্। দ্বিতীয় স্ত্রী সাধারণতঃ প্রথম স্ত্রীর একই গোত্রে ও মাতার বংশে অথবা অন্য গোত্র হইতে আসে। বিধবা বা বিপত্নীক বিবাহ গারো সমাজে খুবই প্রচলিত। একজন পুরুষ তাহার কাকার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। সে সর্বদা জীক্-মামং স্ত্রী রূপে থাকে। এমন কি সে কাকার বিধবা স্ত্রীর কন্যাকে (F. B. D.) বিবাহ করিয়া থাকে। যদি বিধবা স্ত্রী ভাইপোকে বিবাহ করিতে রাজী না হইয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করে তাহা হইলে ভাইপো কাকীমার নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করে।

সম্পত্তির লোভে বিবাহ (Marriage by inheritance) গারো সমাজে খুব বেশী প্রচলিত কারণ ইহাদের মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ সেইজন্য মেয়েরাই সম্পত্তির মালিক হয় এবং নোকরম বা জামাতা স্ত্রীর গৃহে বসবাস করে। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে বিধবা শাশুড়ী সম্পত্তির মালিক হয়। বিধবা শাশুড়ী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিলে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক সেইজন্য সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকে। অনেক সময় নোকরম জামাতা বিবাহ করিতে অস্বীকার

করিলে শাশুড়ী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে এবং যদি খুব বেশী বয়স্কা হয় সন্তানলাভের আশা না থাকে তাহা হইলে পোষ্য কন্যা রাখে। সেই সম্পত্তির মালিক হয়। বিধবা স্ত্রী স্বামীর বড়ভাই বা ছোটভাইকে বিবাহ করিতে পারে।

বিবাহ অনুষ্ঠান—গারো সমাজে বিবাহের জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হয় না। কেবলমাত্র দাম্পত্য জীবন সুখী বা অসুখী হইবে বুঝিয়া লয়। আকাউইদের মধ্যে যে বিবাহ অনুষ্ঠান হয় তাহাকে বলে 'দোসীয়া', উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিলে একদিন উভয় পক্ষ এবং তাহাদের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পুরোহিত একটি মোরগ ও একটি মুরগী লইয়া তাহাদের মাথা একত্রিত করিয়া কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। মুরগী দুইটি মারা যাইবার পূর্বে ছটফট করে সেই সময় সকলে লক্ষ্য করে এবং শুভ অশুভ দৃষ্ট হয়। যদি মোরগ ও মুরগীটি পরস্পরের দিকে ঠোঁট রাখিয়া মারা যায় তাহা হইলে দাম্পত্যজীবন সুখের হইবে এবং বিবাহ বন্ধন ঘটিবে। আবেংদের মধ্যে কিছুটা তফাত দেখা যায়। মোরগ মুরগী দুইটির মাথায় আঘাত করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর যদি মোরগটি কন্যার দিকে এবং মুরগীটি পাত্রের দিকে মুখ করিয়া থাকে তাহা হইলে বিবাহ শুভ হইবে। এইভাবে বিবাহ ঘটিয়া থাকে।

অবিবাহিত ছেলের মধ্যে যৌন সঙ্গমে বাধা থাকে না এবং ইহা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।

বিবাহ বিচ্ছেদ—যদিও অবিবাহিত জীবনে যৌন সঙ্গমে বাধা থাকে না তথাপি স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হইলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয় তাহার কান ছিঁড়িয়া ফেলা হয় এবং এমনকি মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তিনটি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে দ্বিতীয়তঃ উভয় পক্ষের মধ্যে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী বা স্বামী অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত হইলে; তৃতীয়তঃ স্ত্রী গৃহকর্ম করিতে রাজী না হইলে বিচ্ছেদ ঘটে।

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ ইচ্ছুক স্বামী স্ত্রীকে গ্রাম্য পরিষদের নিকট জানাইতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিকট হইতে বিচ্ছেদঘটিয়া থাকে। স্ত্রী, পরিষদের সম্মুখে বিচ্ছেদের কথা উত্থাপন করে। বিচ্ছেদ দুইভাবে ঘটিয়া থাকে। পরিষদের সম্মুখে স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিয়া অথবা ক্ষতিপূরণ না দিয়া।

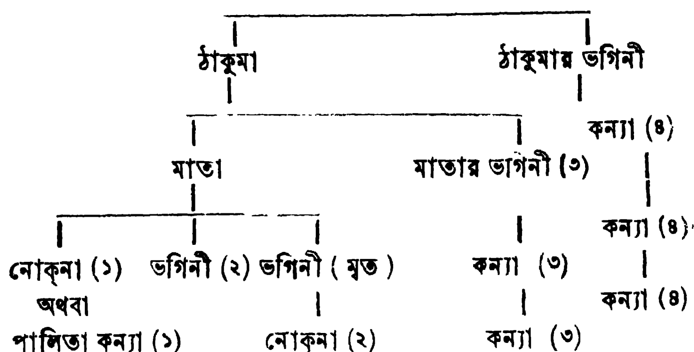
সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার—জমিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় 'আ-কিং' অর্থাৎ প্রশস্ত জমি। ইহার উত্তরাধিকার কোন বিশেষ গোত্র বা বংশ। বংশের একজন স্ত্রী এই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। 'আ-মিলাম', 'আ' অর্থে জমি 'মিলাম' অর্থে গারোদের যুদ্ধের তরবারী। এই জমির ক্ষেত মালিক থাকে না। গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি গ্রামের নোক্‌মা বা গ্রাম প্রধানের স্ত্রীর নামে থাকে। এই জমি গোত্রের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করিতে পারে না। গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীরা যাহার যা প্রয়োজন নোক্‌মার নিকট হইতে লইয়া চাষ করিতে পারে কিন্তু ইহার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে কর দিতে হয়। কিন্তু এই কর ঠিকমত ধার্য করা হয় না সেইজন্য প্রত্যেক পরিবার হইতে গড়ে ৪·৭৫ টাকা করিয়া আদায় করা হয়। এই জমিগুলি হইতেছে ঝুম জমি, গৃহ সংলগ্ন জমি বা ফলের বাগান। পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে ঘরবাড়ী, গরু, ছাগল, মুরগী, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে জামাকাপড়, অস্ত্রশস্ত্র, গহনা ইত্যাদি। গারোদের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির মালিক হইতেছে মাতা। তাহার মৃত্যুর পর তাহার নির্দিষ্ট কোন মেয়ে সম্পত্তির মালিক হয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মালিক হওয়ার মত বিবেচিত সে মালিক হয় এবং তাহাকে বলা হয় 'নোক্‌না' (উত্তরাধিকারিণী)। নোক্‌নার মাতার মৃত্যুর পর, নোক্‌না সমস্ত সম্পত্তির মালিক, এমন কি তাহার নিজের অন্যান্য ভগিনীদের মাতার সম্পত্তির উপর কোন দাবী থাকে না। এই নিয়মের জন্য বর্তমানে অনেকে নোক্‌না বলিয়া কোন কন্যাকে স্বতন্ত্র করে না যাহাতে সকল কন্যা সমানভাবে সম্পত্তির মালিক হইতে পারে। অনেকের কন্যা না থাকিলে পালিতা কন্যা রাখে। সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। কন্যা না থাকিলে সম্পত্তি মাতার নিকটতম আত্মীয়ার নিকট হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে সম্পত্তির মালিক হওয়ার নিয়মগুলি হইতেছে :—

(১) মাতা হইতে তাহার 'নোক্‌না' কন্যা অথবা পালিতা কন্যা।

(২) নোক্‌না কন্যার অভাবে তাহার (নোক্‌না) অন্যান্য ভগিনীরা অথবা ভগিনীর অবর্তমানে তাহাদের কন্যা।

(৩) মাতার ভগিনীরা বা তাহাদের কন্যারা বা তাহাদের কন্যার কন্যারা।

(৪) মাতার মাতার ভগিনী অথবা তাহাদের কন্যা হইতে কন্যা ও তাহার কন্যা ইত্যাদি।



মৃত্যু ও সৎকার- মৃত্যু সম্পর্কে তাহাদের বিশ্বাস শরীরের মধ্যে আত্মা বাস করে। আত্মা শরীর হইতে ছাড়িয়া মাংরু এবং মাংরাম স্থানে চলিয়া যাইলে মানুষের মৃত্যু হয়। মাংরু এবং মাংরাম হইতেছে আত্মার বাসস্থান এবং ইহাই হইতেছে আত্মার ভালো মন্দের বিচার্য স্থান। এখানে আত্মা স্থায়ী হয় যতদিন না পুনরায় মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। আবার আত্মার আবির্ভাব ঘটে যখনই শিশুরূপে জন্ম হয়, তখনই মনে করে সেই আত্মার পুনরায় জন্ম হইয়াছে। তাহাদের আরও বিশ্বাস মৃত্যুর পূর্বেও আত্মা ছাড়িয়া যাইতে পারে এবং অপর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর কারণ অনুযায়ী আত্মার পরিণতি ঘটে যেমন কেহ দড়িতে ফাঁস লাগাইয়া অপঘাতে মৃত্যু ঘটাইলে সে গোবরপোকা রূপে জন্মগ্রহণ করে। আবার বাঘ হাতীর আক্রমণে মৃত্যু ঘটিলে পুনরায় সেই জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন ক্ষেত্রেই মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে না।

স্বাভাবিক মৃত্যুতে গারোরা মৃতদেহকে দাহ করে এবং সাধারণতঃ রাত্রিতে দাহ করা হয়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীকে কোন সময়ই দাহ করে না। সেই মৃতদেহকে কবর দিয়া থাকে। আগেকার দিনে রোগীর শেষ অবস্থার দিকে তাহাকে মদ খাওয়াইত ও তাহাকে এবং তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে রাখিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিত। অনেক সময় দুরারোগগ্রস্ত রোগীকে লোকালয়ের বাহিরে জঙ্গলের বহুদূরে কিছু

খাবার দিয়া রাখিয়া আসিত। ইহাতে অনাহারে মারা যাইত। বাঘের দ্বারা মৃত্যু ঘটিলে জঙ্গলে যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই স্থানে মৃতদেহকে দাহ করিয়া থাকে। সেই দাহর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পুড়াইয়া ফেলে। তাহার জিনিস ব্যবহার করা তাহাদের ধর্মীয় নিষেধ। স্ত্রী বা পুরুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর নোক্‌না বা ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মদ দ্বারা শরীর ধৌত করে এবং গরীবদের ক্ষেত্রে জল দ্বারা ধৌত করে। তারপর মৃতদেহকে প্রধান ঘরের মধ্যে শায়িত করে। ধনীদের ক্ষেত্রে ধাতুর তৈয়ারী পেটা ঘড়ির উপর শায়িত করে এবং গরীবদের ক্ষেত্রে বাঁশের পাটাতনের উপর শায়িত করে। তারপর প্রত্যেক হাতে দেয় একটি করিয়া টাকা। ইহাই মাংরু এবং মাংরাম যাইবার আত্মার পাথেয় স্বরূপ। মৃতদেহকে পিঠের দিকে শায়িত করিয়া তাহার হাত পিছনের দিকে বাঁধিয়া দেয় এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দুইটি একত্রে বাঁধিয়া দেয়। তারপরে মৃতের পায়ের সহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে মুরগী এবং স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে মোরগ বাঁধিয়া রাখে ও মুরগীর খাদ্যের জন্য ঝুড়িতে করিয়া খাদ্য দেয় এবং মৃতের জন্য রান্না খাদ্য ও মদ দেয়। এইভাবে মৃতদেহকে দুদিন ও এক রাত্রি রাখিয়া দেয়, দ্বিতীয় রাত্রিতে দাহ করা হয়। শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় শোভাযাত্রা করিয়া গাংচি অর্থাৎ খাটিয়া করিয়া লইয়া যায়। দাহস্থানে প্রথমে চারিকোণায় চারিটি কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া থাকে তারপর বড় বড় কাঠ সজ্জিত করে। মৃতদেহকে কাঠের উপর রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। সাধারণতঃ পোড়াবার জন্য মান্দাল গাছের কাঠ পছন্দ করিয়া থাকে। অন্য কাঠ দ্বারা পোড়াইলে পরের জন্মে শরীর ভাল হইবে না। যেমন শিমূল কাঠ দ্বারা পোড়াইলে আত্মার দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে। পরের দিন সকালে সদ্য বিধবা বা বিপত্নীক অথবা নিকটতম আত্মীয় মাটির পাত্রে চাউল, চিংড়ি মাছ, ডিম, জল প্রভৃতি, যদি সম্ভব হয় শ্মশানের আগুনে রান্না করে এবং রান্নার হাঁড়িকে ভাঙ্গিয়া দেয়। আত্মা সেই রান্না খাদ্য খাইবে। ইহাকে বলে মীমেমাং বা ভূতের খাদ্য। পোড়ানো শেষ হইলে ছাইগুলি ঝুড়িতে করিয়া জঙ্গলের এক প্রান্তে জড় করিয়া রাখে। পরে দাহ স্থান হইতে ছোট ছোট হাড়গুলি সংগ্রহ করে এবং আকাউইদের মধ্যে ঐ হাড়গুলি একটি কোণাকৃতি ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া মৃতের বাড়ির সম্মুখে একস্থানে রাখিয়া দেয়। তারপর ইহাতে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া একটি খাঁজযুক্ত বাঁশ মাটির সহিত ঝুড়ির

সংযোগ করে। ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তি প্রত্যহ এই হাড়গুলির মধ্যে আসিবে এবং প্রত্যেকদিন তাহার উদ্দেশ্যে ভাত উৎসর্গ করে, যতদিন না পরবর্তী অনুষ্ঠান হয়। আবেক এবং চিসাক্‌দের মধ্যে হাড়গুলি সংগ্রহ করিয়া মৃতব্যক্তির ঘরের সম্মুখে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। রুগ এবং চিবক্ ছাড়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে তাহার ঘরের সম্মুখে একটি কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া রাখে ইহাকে বলে 'কীমা'। পরবর্তী সৎকার অনুষ্ঠান হইতেছে 'ডেলাং সোয়া'। ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। সকলে মিলিয়া মৃতের সম্মুখস্থ কপালের হাড় লইয়া মদ্য পান করে এবং নৃত্য করে। তারপর এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে হাড়গুলি নদীতে বিসর্জন দেয়। এইভাবে পরবর্তী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মাথা শিকার—গারোরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। যে সকল গারো গিরি কন্দরে বসবাস করে তাহারা সুযোগমত সমতলবাসীদের উপর সশস্ত্র দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করিত এবং মাথা কাটিয়া লইয়া আসিত। ইহা যেন তাহাদের একটি আনন্দ এবং সাহসের পরিচয়। এই ধরনের কিছু তথ্য ম্যাকেনজীর "North-East of Frontier Bengal"-এ পাওয়া যায়। শুধু সমতলবাসীদের উপর নয় নিজ গোষ্ঠীর গারো সম্প্রদায়ের মধ্যেও আক্রমণ এবং মাথা শিকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। গারো পার্বত্য অঞ্চলে ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এক গ্রাম অপর গ্রামকে আক্রমণ করে এবং গ্রামবাসীদের ধরিয়া লইয়া আসে আবার মাথা কাটিয়াও লইয়া আসে। ১৮৭৬ সালে একটি আক্রমণের নিদর্শন পাওয়া যায় ইহাতে প্রায় ২০০র বেশী মাথা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়।

গ্রাম সংগঠন—সমাজে যে সকল বিরোধ উপস্থাপিত হয় তাহা উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হইয়া থাকে। তাহাছাড়া গারোদের মধ্যে একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা গ্রামের কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত। ইহাদের বলে 'লাশ্‌কার'। ইহারাই বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন প্রকার অন্যায়, বিরোধ, বিবাদ ঘটিলে তাহারা গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের সদস্য লইয়া একটি সভার আহ্বান করে। সকলের উপস্থিতিতে লাশ্‌কারগণ যে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। এই সভাকে বলে 'মেল্লা'। সভা সাধারণতঃ বাদী পক্ষের গৃহে বসিয়া থাকে।

এই সভাতে নোক্‌মা অর্থাৎ গ্রামের প্রধান পূজারীও উপস্থিত থাকে। সময় সময় নোক্‌মা এবং অন্যান্য সদস্যরা নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহাদের গুরুত্ব কম। প্রধানতঃ যে দুইটি বিষয় লইয়া বিরোধ উত্থাপিত হয়। তাহা হইতেছে প্রথমতঃ সম্পত্তির উপর অধিকার; দ্বিতীয়তঃ অবৈধভাবে যৌন সঙ্গম। যৌন-সঙ্গমের আচরণ দুইভাগে হইয়া থাকে যেমন অবিবাহিত ছেলেমেয়ের মধ্যে যৌন সঙ্গম এবং স্ত্রী-পুরুষের একজন অথবা উভয়েই বিবাহিত অথচ স্বামী স্ত্রী ব্যতিত অন্য কাহারও সহিত যৌন সঙ্গম। আবার বিবাহ বিচ্ছেদও শাসন সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের আওতায় আসে। যে কোন বিষয় হোক সমস্তই সকলের মতামত লইয়া লাশ্‌কারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরাধীর যে সকল শাস্তি গ্রহণ করা হয় তাহারা হইতেছে ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থদণ্ড, শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা। এই তিনটি ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শাস্তি নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্বের উপর।

ধর্ম ও অনুষ্ঠান—গারোরা জড় উপাসক, ইহাদের উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে নানা ধরনের পশুপক্ষী উৎসর্গ করা এবং সেই সঙ্গে মদ্যপান ও নাচ। প্রায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল জুড়িয়া কতকগুলি প্রতিকৃতি রূপে বাঁশের খাড়া দণ্ড তৈয়ারী করে, এইগুলি ঠিক দেবী আকৃতি নয়। দণ্ডগুলির নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নাই। ইহার গঠন আত্মা অনুযায়ী তফাত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 'সাম্‌বাশিয়া', বাঁশের কাঠামোর তৈয়ারী চার-ফুট লম্বা ও দুইফুট চওড়া এবং লতাপাতা দ্বারা ঢাকা। 'চোরাবুদি' আর এক ধরনের প্রতিকৃতি ইহা তিনফুট উচ্চতা বিশিষ্ট্য এবং মাটি দ্বারা ঢাকা। তৃতীয় ধরন হইতেছে 'সেক্‌রেক'। ইহাদের উদ্দেশ্যে পশুপক্ষী উৎসর্গ করার পর ইহাদের রক্ত প্রতিকৃতিতে ছিটাইয়া দেয়। রাস্তার ধারে ধারে প্রায় চোখে পড়ে খড়ের উপর মাটির প্রলেপ দ্বারা প্রতিকৃতি এবং বাঁশের কাঠি গাঁথা থাকে ও পাখীর রক্ত প্রতিকৃতিতে ছিটাইয়া দেয়। তাহাছাড়া গাছের তলায় বেদী করিয়া তাহাতে রক্ত ছিটাইয়া দেয় ও পশুপক্ষী উৎসর্গ করে। উৎসর্গের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যাধির প্রকৃতি অনুযায়ী। সবগুলিই ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য পালন করে। ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া ছাড়াও কতকগুলি যৌথ গ্রামীণ উৎসব পালন করে। এই উৎসব পালন করে জঙ্গলের বিপদ হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য এবং কোন কিছু অঘটনের হাত হইতে

বাঁচার জন্য। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 'আশংতাতা'। তাহাছাড়া গ্রামের সীমান্তে কয়েকটি পাথর দাঁড় করাইয়া রাখে। ইহাদের বলে 'আশং'। ইহাদের উদ্দেশ্যে ছাগল বানর, ইঁদুর উৎসর্গ করে।

কৃষির দেবতা হইতেছে 'রোকিমি' অর্থাৎ ধান্যমা। ইহার উদ্দেশ্যে দুইটি উৎসব পালন করে। ব্যক্তিগত উৎসব হইতেছে 'গিট্টচিপং', এবং সমষ্টিগত গ্রামীণ উৎসব হইতেছে 'মিচিল্‌তাতা', ইহার উদ্দেশ্য ভাল ফসল হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, বৃষ্টি ভূমিকম্প, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি হইতে রক্ষার জন্য উপাসনা করে এবং উৎসর্গ করে।

পূর্বপুরুষের স্মৃতি রক্ষার্থে তাহারা হাড়ের স্মৃতি সৌধ তৈয়ারী করে এবং তাহার উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গ করে।

গারোরা নানা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। তাহারা মনে করে একধরনের শক্তিই পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ। 'তাতারা-রাবুগা' ধরিত্রীর স্রষ্টা, 'চোরাবুদি' শস্যরক্ষক, 'শালজং' ক্ষেত্র উর্বরতার দেবতা 'গোরিয়া' বজ্রবিদ্যুতের দেবতা, 'কালকামি' মানুষের জীবন রক্ষক প্রভৃতি নানারকম দেবদেবী অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। সুতরাং দেখা যাইতেছে গারোরা নিজেদের ও সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। বর্তমানে অনেকে খৃষ্টান হইয়াছে তাই ঐতিহ্যবাহী প্রকৃতি পূজা তাহাদের মধ্যে আর বিশেষ চলন নাই। ইহার ফলে তাহাদের সামাজিক অনুশাসনও পরিবর্তিত হইয়াছে।
